
মাসুদ রানা
অপহরণ ২
কাজী আনোয়ার হোসেন
A 415 TYE

মাসুদ রানা

অপহরণ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: জুন, ১৯৮৭

এক

পাহাড় ঘেরা বনভূমি, মাঝখান দিয়ে চওড়া পাকা রাস্তা শহরের দিকে চলে গেছে। নির্জনতা-প্রিয় কিছু লোক ঘর-বাড়ি বানিয়ে বাস করে জঙ্গলে। বাড়িগুলো কাছাকাছি নয়, মাঝখানে এক-আধ মাইলের দূরত্ব।

রাস্তার পাশে বড় একটা ফাঁকা মাঠ, ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঝাঁকড়া মাথা অনেকগুলো প্রাচীন গাছ। গির্জাটা এক ধারে, দরজার মাথায় নগ্ন একটা বালব জ্বলছে।

রাস্তার এপারে, অন্ধকার জঙ্গলের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে হেনরি পিকেরিং। রাস্তা ছাড়িয়ে মাঠে, একটা গাছের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে তার দৃষ্টি। গাছের পাশে একটা ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেল সে। লোকটার গায়ের রঙ আর কাপড় আলাদা করে চেনার উপায় নেই। লোকটা একা, তাকিয়ে আছে গির্জার দিকে।

চোখে নাইট-গ্লাস তুলে লোকটার দিকে তাকাল পিকেরিং। গির্জার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে রয়েছে লোকটা, নগ্ন বালবের ম্লান আলোয় ভাল করে দেখা গেল না তাকে। তবু চিনতে পারল সে। এগম্যান-ই।

রবার্ট এগম্যান। প্রাক্তন বেসবল সুপারস্টার। সাংস্কৃতিক দল বিনিময় চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেণ্ট দক্ষিণ

আফ্রিকায় পাঠিয়েছে তাকে, স্থানীয় কালোদের সংগঠন লিটল লীগ বল টীমের কোচ হিসেবে। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতাসীন শ্বেতাঙ্গদের অসন্তুষ্ট না করে কালোদের সাথে আমেরিকার একটা সুসম্পর্কের ভিত তৈরি করা। এর মধ্যে লুকোচুরির কিছু ছিল না, রাজনৈতিক কুটিলতা ততটা স্থান পায়নি।

যদিও, কেউ জানে না যে রবার্ট এগম্যান আসলে একজন সি.আই.এ. এজেন্ট। এখানে তার গোপন কাজটা হলো, চরমপন্থী নিগ্রো নেতাদের সাথে যোগাযোগ রাখা, আতঙ্কিত শ্বেতাঙ্গ সরকার যাদেরকে নজরবন্দী করে রেখেছে। নজরবন্দী নেতাদের সাথে বাইরের দুনিয়ার কোন যোগাযোগ থাকে না, কর্মহীন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হয় তাদের। ডিপ্লোম্যাটিক পাস থাকায় যেখানে খুশি যেতে পারে এগম্যান, যার সাথে খুশি দেখা করতে পারে। তাকে পেয়ে যেন চাঁদ হাতে পায় বন্দী নেতারা। মন খুলে কথা বলে। এভাবে চরমপন্থীদের ভবিষ্যৎ প্ল্যান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত সব অনায়াসে জানতে পারে এগম্যান। এগম্যানের রিপোর্ট পেয়ে সি.আই.এ. দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে সু (?) পরামর্শ দিতে পারে। এগম্যান নিজে নিগ্রো হওয়ায় সহজেই আফ্রিকান নিগ্রোদের ভালবাসা আর বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে। সি.আই.এ-ও লাভবান হয়েছে, এগম্যানকে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাঠাবার পর থেকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের খবরাখবর আগের চেয়ে অনেক বেশি, প্রায় দ্বিগুণ হারে আসছে। হ্যাঁ, এজেন্ট হিসেবে এগম্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের মেয়ে টিউলিপ। বার্লিনে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেলেও, আবার ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। চোখে নাইট-গ্লাস তুলে পিকেরিং দেখল গাছটাকে পিছনে রেখে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এগম্যান। খানিক এগিয়ে থামল সে, ডানে-বাঁয়ে ভাল করে দেখে নিল। না, কাছেপিঠে কাউকে দেখল না। মাঠের ওপর

দিয়ে এবার হন হন করে এগোল সে। সোজা গিয়ে থামল গির্জার দরজার সামনে। হাত বাড়িয়ে কবাটে ঠেলা দিল এগম্যান।

খুলে গেল দরজা।

গির্জার ভেতর অন্ধকার আর অটুট নিস্তব্ধতা। দোরগোড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে চোখে অন্ধকার সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করল এগম্যান। ধীরে ধীরে মৃদু আলোর ক্ষীণ একটু আভা দেখা গেল এনট্রান্স হলে। সামনে বাড়ল সে, আলোর উৎস লক্ষ্য করে এগোল। গির্জা পবিত্র স্থান, তবু তার গা ছমছম করতে লাগল।

ওল্ড সাউথ একটা মেথোডিস্ট চার্চ। দেয়াল বা সিলিং থেকে ঝলমলে ঝালর বা রঙচঙে পর্দা নেমে আসেনি। শক্ত কাঠের মেঝে, সার সার গদিহীন আসন। সাধারণ একটা বেদি। বেদির ওপর সাদামাঠা ধরনের একটা সোনার ক্রুশ, একটা বাইবেল, একজোড়া মোমবাতি। দেয়ালগুলো খালি, সাদা রঙ করা। দু'দিকে লম্বা লম্বা জানালা, কিন্তু কোন জানালায় কাঁচ নেই।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করল এগম্যান। ব্যাক-আপ টীম থাকার কথা, কোথায় তারা? হেনরি পিকেরিঙের কথা মনে পড়ল তার। সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের ডেপুটি লোকটা, ডান হাত। সে-ই বা কোথায়? তাকে সে কথা দিয়েছে, শুধু গির্জার ভেতরটা নয়, বাইরেটাও কাভার দেয়া হবে। সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় সি. আই.এ-র ছয়জন এজেন্ট উপস্থিত ছিল, প্রার্থনা শেষে তারা আর বেরিয়ে যায়নি—অন্তত বেরিয়ে যাবার কথা নয়। কিন্তু কোথায় তারা? ঝুল-বারান্দায়? নাকি পিকেরিং তার কথা রাখেনি? হয়তো বেদির পিছনে কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে, আড়াল থেকে লক্ষ রাখছে চারদিকে।

বার্লিনে যা ঘটে গেছে তারপর আর ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। এ-ব্যাপারে সবাই একমত হয়েছিল। কিন্তু পিকেরিং

ষোলো আনা নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, এগম্যান সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে, তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারবে না কেউ। তাছাড়া, গির্জার ভেতর কোথাও বসে কিছু পান করতে হবে না এগম্যানকে। অ্যারোকে যেমন হয়েছিল।

পিছনের দেয়াল ঘেঁষে এগোল এগম্যান, তারপর অনেকগুলো সাইড প্যাসেজের একটা ধরে বেদির দিকে যাবার সময় জানালার সামনে মাথা নিচু করে রাখল। রাস্তা দিয়ে পুলিস প্যাট্রোল আসা-যাওয়া করে, তাদের চোখে ধরা পড়ার কোন ইচ্ছে ওর নেই। এদিকে চরমপন্থী কালোদের তৎপরতা নতুন কোন সমস্যা নয়, প্রতি রাতেই কারফিউ জারি করা হয়। এই অসময়ে গির্জার ভেতর কালো কোন লোককে দেখলে হাতে হাতকড়া না পরিয়ে ছাড়বে না পুলিস। ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট থাকায় ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে, কিন্তু পাসপোর্টের মর্যাদা বুঝতে সাধারণ পুলিসের সময় লাগবে কম করেও আটচল্লিশ ঘণ্টা।

সামনে কয়েকটা নিচু সেলফ দেখল এগম্যান, ধর্ম-সঙ্গীতের বই আর প্রসাদ রাখার জন্যে কয়েকটা পাত্র রয়েছে ওগুলোয়। এখান থেকে কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে বেদির দিকে। সিঁড়ির ধাপে একটা এনভেলোপ দেখল সে।

সাদা খাম। চিঠি আকারের। ভুলে কেউ ফেলে গেছে বলে মনে হলো না। ধাপের ঠিক মাঝখানে যত্ন করে রেখে যাওয়া হয়েছে। খোলা জায়গায়, সহজেই যাতে চোখে পড়ে।

সিঁড়ির দিকে এগোল এগম্যান। এনভেলাপটা তোলার জন্যে ঝুঁকল সে। সিধে হতে যাবে, একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। ওর ডানে, উঁচু কোথাও থেকে এল।

আওয়াজটা শুনেই ঘাড় ফেরাতে শুরু করল এগম্যান, জানে, এরই মধ্যে দেরি করে ফেলেছে সে। উঁচু জানালার দিকে তাকাবার সুযোগ হলো না, কড়াৎ করে একটা বিস্ফোরণের শব্দের

সাথে ধাক্কা খেল সে।

বুলেটটা ব্রেনে ঢুকে গেল, বিস্ফোরিত হলো এগম্যানের মাথা। একদিকে ঘুরে গেল শরীরটা, তারপর কাত হয়ে দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ল একটা আসনের ওপর, সেখান থেকে গড়িয়ে নেমে গেল মেঝেতে। নগ্ন কাঠ, ভেসে গেল রক্তে।

গির্জার ভেতর কাঠের সিঁড়িগুলোয় ছুটোছুটির আওয়াজ শোনা গেল। কিন্তু এখন আর কারও কিছু করার নেই। যে যাবার সে চলে গেছে। সমস্ত শব্দকে ছাপিয়ে উঠল গমগমে একটা যান্ত্রিক আওয়াজ।

বাইরে, অন্ধকার মাঠের ওপর আকাশে কালো একটা সচল ছায়া। পাহাড়গুলোর আড়াল থেকে উড়ে এসেছে ওটা। কালো আকাশের গায়ে কালো রঙ করা একটা হেলিকপ্টার। গাছগুলো থেকে অনেকটা ওপর স্থির হলো যান্ত্রিক ফড়িং, সাপের মত কি যেন একটা এঁকেবেঁকে নেমে এল সবচেয়ে উঁচু গাছটার মগডালে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই আবার সচল হলো কপ্টার। দেখতে দেখতে পাহাড়গুলোর দিকে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল আবার।

জঙ্গল থেকে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল পিকেরিং। অসহায় ভঙ্গিতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, হাতে পিস্তল। কপ্টারটা ফিরে যাচ্ছে দেখে চট করে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল। ঠিক মাঝরাত।

বিস্ফোরিত হলো গির্জার দরজা। তার দিকে কে যেন ছুটে আসছে। না, এগম্যান নয়। গিনিপিগ।

মেয়েটা কিছু বলার আগেই পিকেরিং বুঝে ফেলল কি ঘটে গেছে। রবার্ট এগম্যান বেঁচে নেই।

□

ব্রিন্দিসি থেকে রওনা হবার পর বিশ ঘণ্টা সাগরে রয়েছে ফেরি।

ফেরিতে ওঠার টিকেট কেটেছে মাসুদ রানা, কিন্তু কেবিন ভাড়া নেয়নি। পিক-আপ ট্রাক রয়েছে, ড্রাইভিং সীটে বসে কাটিয়ে দেবে বাকি সময়টা। রেস্তোরাঁতেও ঢোকার দরকার হবে না, সাথে খাবার আছে—রুটি আর মাখন, জেলি আর পনির, এক লিটার ইটালিয়ান ওয়াইন। একান্তই যদি ঘুমাতে চায়, সীটের নিচে ওর আরোহীর মত, ট্রাকেই ঘুমিয়ে নেবে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ফেরির ডেকে সার সার দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের যানবাহন। আশপাশে সঙ্গী-সাথীর কোন অভাব নেই ওর। গরীব ইটালিয়ান আর গ্রীক ড্রাইভাররাও যার যার গাড়িতে বসে রাত কাটাচ্ছে। ওপরতলায় বিলাসবহুল কেবিনে যারা ভ্রমণ করছে তারা সবাই ভাগ্যবান ট্যুরিস্ট। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে, আশপাশ থেকে নাক ডাকার আওয়াজ পেল রানা। ওর চোখে ঘুম নেই। সিগারেটে টান দিতে দিতে নিকট ভবিষ্যতের কথা ভাবছে ও।

পোলোপোনেসাস-এর উত্তর উপকূল প্যাট্রাস-এ ভিড়বে ফেরি। সেখান থেকে পুব দিকে ট্রাক ছাড়বে রানা, পেরিয়ে যাবে কোরি∫ ক্যানাল। এথেন্সের বন্দর পিরিয়াস-এ পৌঁছে আরেকবার পরিচয়পত্র এবং বাহন পাল্টাবে। আবার ফেরিতে চড়ে দক্ষিণে যাবে, ক্রিট দ্বীপের হেরাক্লিয়ন-এ।

ক্রিট একটা দুর্গম দ্বীপ, ওখানকার মানুষগুলো কর্কশ, বড় বেশি স্বাধীনচেতা। ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কাউকে ওরা নাক গলাতে দেয় না, তেমনি কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানো পছন্দও করে না। আপনমনে হাসল রানা। শহর থেকে দূরে, শহরতলিতে থাকবে ও, ট্যুরিস্ট স্পটগুলোর ধারেকাছে ঘেঁষবে না। ওকে, বা ওর সাথে গ্রাম্য কাপড় পরা বাচ্চা ছেলেটাকে দেখে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।

টিউলিপের ছদ্মবেশ একেবারে নিখুঁত হয়েছে। কেউ দেখে

মেয়ে বলে চিনতে পারবে না, প্রেসিডেন্টের মেয়ে বলে চেনা তো দূরের কথা।

সিগারেট ফেলে দিয়ে খানিকটা ওয়াইন খেলো রানা। গন্তব্যে না পৌঁছে ঘুমাতে চায় না ও। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবছে না, ভাবছে টিউলিপকে নিয়ে। হঠাৎ যদি ওষুধের প্রভাব কেটে যায়, সচেতন হয়ে ওঠে মেয়েটা? যদি কান্না জুড়ে দেয়?

না, জেগে থাকাই ভাল।

রঙিন নকশা কাটা ডানা মেলে এক ঝাঁক প্রজাপতি উড়ছে বাগিচায়। সুইমিং পুল ঘিরে থাকা সার সার ফুলগাছে বসন্তের ডাকে রঙচঙে ফুল ফুটেছে, মধু আহরণে মাতোয়ারা মৌমাছিদের গুঞ্জনে দেহ-মনে পুলক জাগে। কিন্তু প্রকৃতি অপরূপ সাজে সাজলেও, হোয়াইট হাউসের কারও মনে শান্তি নেই। সিক্রেট এজেন্ট থেকে শুরু করে কর্মচারী, চাকরবাকর, কর্মকর্তা, সবাই বিষণ্ন এবং গম্ভীর। দৈনন্দিন কাজকর্ম থেমে থাকার নয়, কিন্তু গভীর মনোযোগের সাথে লক্ষ করলে টের পাওয়া যায় উত্তেজনায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ।

সুইমিং পুল থেকে উঠে এলেন প্রেসিডেন্ট, গা থেকে পানি ঝরছে কংক্রিট অ্যাপ্রন-এ। হালকা নীল একটা আলখাল্লায় গা ঢাকলেন তিনি। পুলের পাশে একটা টেবিল সাজানো হয়েছে। ইঙ্গিতে তিনি সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডকে কাছে ডাকলেন।

তেতে উঠেছে রোদ, শার্ট আর টাই পরে ঘামছেন জেফ রিকার্ড। রুমাল দিয়ে ঘাড়টা মুছে টেবিলের আরেক দিকে, প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি বসলেন তিনি। সুইমিং পুলে প্রায়ই আসেন ওঁরা, দ্রুত খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে লাঞ্চ সারেন, তারপর ফিরে যান যাঁর যাঁর নিজের কাজে। দু'জনে এক সঙ্গে শরীর শিথিল করে নেন, খানিক বিশ্রাম পেয়ে আবার তীক্ষ্ণ আর ঝরঝরে হয়ে

ওঠে মাথা।

কিন্তু আজ আর তা হবার নয়। রোদ তেতে উঠলেও, প্রেসিডেন্টের চেহারা যেন বরফের মুখোশ। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছেন তিনি। এই মুহূর্তে রানা যদি তাঁর সামনে থাকত, ওর মনে প্রশ্নটা নিশ্চয়ই জাগত: সত্যিই কি প্রেসিডেন্ট তাঁর মেয়েকে কিডন্যাপ করার অনুমতি দিয়েছেন?

'তুমি আমার রিপোর্ট পড়েছ,' জেফ রিকার্ড বললেন।

'হ্যাঁ, পড়েছি,' শান্তভাবে জবাব দিলেন প্রেসিডেন্ট, যেন প্রতিজ্ঞা করেছেন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাবেন না। 'আর তাই সেক্রেটারি অভ স্টেট থেকে শুরু করে কেউই সারাটা সকাল আমার সাথে দেখা করতে পারেনি।'

নীরবে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড।

'বলো তো, জেফ, সাংস্কৃতিক চুক্তির আওতায় আমরা যখন রবার্ট এগম্যানের মত কোন লোককে বিদেশে পাঠাই, আমরা তার রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা সম্পর্কে গ্যারান্টি দিই, নাকি দিই না?'

'রাষ্ট্র দেয়। আমি দিই না।'

'অবভিয়াসলি!' টেবিল থেকে মুখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, চোখে ঠাণ্ডা আগুন ঝরছে। 'আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়ম-নীতি ভেঙে কোথায় তুমি পৌঁছুতে চাও, জেফ?'

পাল্টা দৃষ্টি হেনে জেফ রিকার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'আর যদি জিজ্ঞেস করতাম?'

'নিশ্চয়ই অনুমতি দিতাম না। ব্যাপারটা বেআইনী।'

'ঠিক তাই,' এমন সুরে কথাটা বললেন রিকার্ড যেন একজন উকিল তার পয়েন্ট সুদৃঢ় যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করল। 'আর বেআইনী বলেই অনুমতির ধার ধারিনি আমি। সুযোগ পেলে সেটাকে আমার কাজে লাগাতে হয়, কারণ ছলে-বলে কৌশলে

তথ্য সংগ্রহ করা আমার দায়িত্ব। তুমিও জানো দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন আগেও আমাদের ইন্টেলিজেন্স অ্যাকটিভিটি কোন ফল দিচ্ছিল না।'

'জানি। কিন্তু আমরাও, তুমি আর আমি, আইনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, সে-কথা ভুলে গেলে চলবে কেন?'

জেফ রিকার্ড চুপ করে থাকলেন। এই মুহূর্তে রানা এখানে উপস্থিত থাকলে আরও একটা প্রশ্ন জাগত ওর মনে, সত্যিই কি সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ড কে.জি.বি.-র চর?

'কি যে এক বিপদের মধ্যে ফেললে!' রেগেমেগে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ব্যাপারটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, আন্দাজ করতে পারো কি ঘটবে? শুধু যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকাকে জবাবদিহি করতে হবে তাই নয়, মিত্র সবগুলো দেশ আমাদের অবিশ্বাস করবে। তারপর আছে কংগ্রেস। ক্রাইস্ট! ওরা টের পেলে স্রেফ ক্রুশে চড়াবে—তোমাকে শুধু একা নয়, আমাকেও। অথচ লাভ কি হলো?' তাঁর চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, আরও একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। 'কে আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে? কেন? কি চায় ওরা? এবং...,' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি, 'আমার টিউলিপ কোথায়?'

জেফ রিকার্ডের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। এত বছরের পুরানো বন্ধুত্ব, অনেক বার অনেক বিষয়েই মতের মিল হয়নি তাঁদের। কিন্তু এবারকার মত পরিস্থিতি কখনও দেখা দেয়নি। ইনি রিচার্ড কনওয়ে নন, প্রেসিডেন্ট। রেগে আগুন হয়ে আছেন। রিকার্ড জানেন, রাগার তাঁর সঙ্গত কারণও আছে।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বলপয়েন্ট পেন বের করলেন সি.আই.এ. চীফ। নার্ভাস ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করছেন ওটা। প্রথম দিকে কেন কে জানে তাঁর মনে হয়েছিল, মেয়ে কিডন্যাপ হওয়ায় রিচার্ড কনওয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন নন। যাকে বলে দুশ্চিন্তায় কাতর

হয়ে পড়া, সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। এমনকি বন্ধুর রাগ দেখেও তাঁর মনে সন্দেহ হয়েছিল, ভান নয় তো? মনের এ সব সন্দেহ কাহিল করে তুলেছিল তাঁকে।

পরে অবশ্য সন্দেহগুলো দূর হয়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, মেয়ের জন্যে সত্যিই অস্থির হয়ে আছেন পিতা। কিন্তু আজ আবার সন্দেহটা ফিরে এল মনে। রিচার্ড কনওয়েের প্রশ্নের ধরন বা শব্দচয়ন তাঁর ঠিক পছন্দ হলো না। 'আমাকে জিজ্ঞেস পর্যন্ত না করে...কোথায় তুমি পৌঁছুতে চাও, জেফ?' প্রেসিডেন্ট যেন আভাসে জানতে চাইলেন, তুমি কি আমার জায়গায় উঠে আসতে চাও?

'আমি জানি না,' প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের উত্তরে বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'কে বা কারা কিডন্যাপ করেছে, কেন করেছে, কি চায় তারা, কোথায় আছে টিউলিপ–কিছুই আমি জানি না। কিন্তু,' বলে দম নিলেন তিনি, 'আমার মাথায় কিছু কিছু আইডিয়া আসছে।'

'আইডিয়া! গডড্যাম ইট! মাল্টিবিলিয়ন-ডলার ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির মাথায় বসে রয়েছ তুমি। কে তোমার কাছে থেকে আইডিয়া পেতে চায়? আমার ফ্যাক্টস দরকার!'

চুপ করে থাকলেন রিকার্ড, তাঁর কিছু বলার মুখ নেই। ফেডারেল গভর্নমেন্টের সমস্ত ক্ষমতা সাময়িকভাবে তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, অথচ এখন পর্যন্ত কোন তথ্য তিনি যোগাড় করতে পারেননি। একটাই বাস্তবতা, সেটাকে বদলাবার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্টের মেয়ে নিখোঁজ, এবং কোন সূত্র নেই যার সাহায্যে তাকে খুঁজে বের করা যায়।

গোটা ব্যাপারটা অর্থহীন বলে মনে হয়। শুধু তাঁর ব্যর্থতা বাদে।

আরও কিছুক্ষণ বন্ধুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন

প্রেসিডেন্ট, তারপর হেলান দিলেন চেয়ারে। 'ঠিক আছে, বলো, শোনা যাক তোমার আইডিয়াগুলো।'

ক্ষীণ একটু স্বস্তিবোধ করলেন জেফ রিকার্ড। ফ্যাক্টের যেখানে অভাব, সেখানে কাজ চালাতে হবে আইডিয়া দিয়ে। 'প্রসঙ্গ দুটো,' বললেন তিনি। 'প্রথমে, মোটিভ। একজোড়া অমূল্য রত্ন হারিয়েছি আমরা, অ্যারো আর এগম্যান। কিডন্যাপাররা শুধু যদি ওদের দু'জনকে চেয়ে থাকে, এখনও বলি আমি, ওদেরকে পাবার আরও অনেক সহজ উপায় ছিল তাদের।'

কোন মন্তব্য না করে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট।

'কাজেই ধরে নিতে হয়,' রিকার্ড বললেন, 'শুধু অ্যারো বা এগম্যানকে নয়, আরও কাউকে বা আরও কিছু চায় ওরা। আরও কেউ মানে ওদের মত অন্য কোন এজেন্ট নয়। আরও বড় কিছু, আরও অনেক বড় ধরনের কিছু টার্গেট করেছে ওরা।' একটু থেমে নাটকীয়ভাবে আবার তিনি বললেন, 'আমার ধারণা, রিচার্ড, ওরা আমাকে চায়। আমিই ওদের টার্গেট।'

'তুমি? তোমাকে?' প্রেসিডেন্টের কপাল কুঁচকে উঠল।

'আমাকে ঠিক ব্যক্তিগতভাবে নয়,' তাড়াতাড়ি বললেন রিকার্ড। 'মনে করো, সি.আই.এ ডিরেক্টরকে। কিংবা হয়তো আরও বড় কোন টার্গেট আছে ওদের। হয়তো ওরা তোমাকে চায়।'

বরফ গলল, মুখোশ সরে গিয়ে বেরিয়ে এল আসল চেহারা, তিক্ত একটু হাসি ফুটল প্রেসিডেন্টের মুখে। আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

'জানি না কেন, অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয়েছে আমার,' ব্যাখ্যা করলেন জেফ রিকার্ড। 'কেউ যেন ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে আমাকে। এবং আমার মাধ্যমে, তোমাকেও। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হলো, সচরাচর যে-সব সাবধানতা অবল'ন করা হয়

সেগুলো বাদ দিয়েই অসম্ভব সব ঝুঁকি নিতে বাধ্য হলাম আমরা। ঠেলে বাইরে বের করে দিলাম অ্যারো আর এগম্যানকে। উপায় ছিল না, কিডন্যাপাররা কোন উপায় রাখেনি। ওরা দু'জনেই খুন হলো, বলতে গেলে ওদের আমরা বলি দিলাম। খুন হলো, অথচ কারা খুন করল জানতে পারলাম না। আরও আশ্চর্য, টিউলিপ সম্পর্কে কোন সূত্রও আমাদের হাতে এল না। এটাই আমার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য লাগছে। কম সময় পেরোয়নি, এরমধ্যে কিছু না কিছু জানার কথা আমার। কেউ বলতে পারবে না হাত-পা গুটিয়ে আমি বসে আছি।'

প্রেসিডেন্ট চিন্তিত, কিন্তু তিনি কোন প্রশ্ন করলেন না। মনে মনে খুশি হলো জেফ রিকার্ড, আর কিছু না হোক, বন্ধুর মনোযোগ ধরে রাখা গেছে। আশা করা যায় খানিকটা সময়ও দেয়া হবে তাঁকে। আরেকবার চেষ্টা করে দেখবেন।

'কাজেই ওটা প্রথম,' বললেন তিনি, 'মোটিভ। 'উঁহুঁ, মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করবে, তা নয়। হয় আমাকে চায়, নয়তো তোমাকে। অথবা সি.আই.এ-কে পকেটে ভরতে চাইলেও আমি আশ্চর্য হব না। কে জানে, হয়তো এ-সব কিছুই নয়, ওরা আসলে সরকারের পতন চাইছে। মোটকথা, ছোটখাট কোন ব্যাপার নয়, রিচার্ড।'

'তোমার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ?'

'কিডন্যাপারদের একজন ইনফরমার আছে,' সাথে সাথে জবাব দিলেন রিকার্ড। 'আমাদের ভেতর কেউ একজন।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'গুড গড!'

'প্রথম আমার সন্দেহ হয় অ্যারো মারা যাবার পর,' বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'তারপর একই ঘটনা আবার ঘটল। ভেবে দেখো না, অ্যারো আর এগম্যানের সাথে যোগাযোগ করতে কি রকম সময় নেব আমরা, তা কি কিডন্যাপারদের জানার কথা?

বিশেষ করে অ্যারোর সাথে? তার বেলায় নিয়ম ছিল, আমরা সঙ্কেত পাঠাব, সে তার সময় এবং সুযোগ মত আমাদের সাথে যোগাযোগ করবে। যোগাযোগ করতে কতটা সময় লাগবে, আমরা কেউ জানতাম না। দু'ঘণ্টা? দু'দিন? অ্যারো যোগাযোগ করার পর প্রথম আমরা জানলাম, কখন গোল্ডেন বারে থাকতে পারবে সে। অথচ নির্দিষ্ট দিনে ঠিকই ওখানে ওয়েটার লোকটা ছিল! নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে–আগে নয়।

'এগম্যানের সময়ও ঠিক তাই ঘটল,' বলে চললেন জেফ রিকার্ড। 'গির্জার বাইরে, একটা গাছের মাথা থেকে গুলি করা হলো তাকে। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে গাছে চড়ে অপেক্ষা করছিল খুনী, এটা সম্ভব, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। এখানেও সেই একই ব্যাপার, নির্দিষ্ট সময়ে হাজির ছিল খুনী।' চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি। 'কোইন্সিডেন্স? একবার, হ্যাঁ; কিন্তু দু'বার হয় কি করে?'

প্রেসিডেন্টের চেহারায় বিমূঢ় একটা ভাব। 'অবিশ্বাস্য, জেফ।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস করা কঠিন।'

'কে সে, তোমার কোন ধারণা আছে?'

মাথা নাড়লেন জেফ রিকার্ড। 'কাউকে আমি সন্দেহ করি না। একজন না-ও হতে পারে, হয়তো কয়েকজন মিলে সর্বনাশটা করছে। তবে যে বা যারাই হোক, এর পরের বার ঠিকই আমি ধরে ফেলব।'

তাঁর দিকে দীর্ঘক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর তাঁর মুখের পেশীতে একটু ঢিল পড়ল। ঘাড় ফিরিয়ে একজন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। দূরে, ওয়েস্ট উইং-এর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। একটা হাত তুলে কাকে যেন কি ইশারা করল সে।

জেফ রিকার্ডের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'তাহলে বলি, শুনে হয়তো তুমি খুশি হবে, পরের বার ঘটনাটা এখানে ঘটতে যাচ্ছে।'

ওয়েস্ট উইং-এর দরজা পেরিয়ে একজন এইড বেরিয়ে এল। এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টের হাতে একটা এনভেলাপ দিল সে। অপেক্ষা না করে, দ্রুত ফিরে গেল লোকটা। প্রেসিডেন্ট কিছু ব্যাখ্যা করলেন না, শুধু এনভেলাপটা সি.আই.এ. চীফের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

এনভেলাপের ওপর পোস্টমার্কটা লক্ষ করলেন জেফ রিকার্ড। ওয়াশিংটন, ডিসি। মুখ তুলে একবার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। তারপর এনভেলাপের ভেতর থেকে বের করলেন কাগজটা।

ছোট্ট একটা চিরকুট। চারটে মাত্র শব্দ টাইপ করা।

'মেরিলিন শার্প। রোটাণ্ডা ক্লাব।'

এবার কোন বিস্ময়ের ধাক্কা লাগল না। জেফ রিকার্ড যেন পাথর হয়ে গেছেন। মেরিলিন শার্প–সি.আই.এ-র আরও একজন ডীপ কাভার এজেন্ট।

'মেরিলিন শার্প,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জানি, তিনি একজন কংগ্রেস সদস্য। তাঁর সম্পর্কে আর কি জানি আমি, জেফ?'

'কংগ্রেসে আমার এজেন্ট,' বিড়বিড় করে বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'তার এই পরিচয় খুব কম লোকই জানে। তোমাকে পর্যন্ত বলিনি।'

ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'তারমানে তোমার সন্দেহই ঠিক। আমাদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের মধ্যে একজন দু'মুখো সাপ আছে। গড, ওহ্ গড!'

দুই

ইলেকট্রনিক বোর্ডে সংখ্যাগুলো জ্বলে উঠছে, সেদিকে তাকিয়ে ভোটের হিসেব কষছে মেরিলিন শার্প। হাউস ফ্লোরের ওপর, গ্যালারি রেইলের মাথায় বোর্ডটা, বোর্ডের উজ্জ্বল আলোর আভায় উল্লাসিত হয়ে আছে তার মুখ। মিটি মিটি হাসি ফুটল কমনীয় চেহারায়। অনেক ভোটের ব্যবধানে জিতছে তারা।

সামনে চেম্বারের পিছনের দেয়াল, প্যাসেজের শেষ সারির একটা আসনে বসে আছে সে। তার আশপাশে দাঁড়িয়ে আছে দলীয় কংগ্রেস সদস্যরা, গভীর রাত পর্যন্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করে সবাই খুব ক্লান্ত, বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করছে। গলা একটু চড়িয়ে ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট সাবকমিটি চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, বাঁ হাতের তর্জনী আর মধ্যমা খাড়া করে চার্চিলের বিখ্যাত বিজয় সঙ্কেত দেখাল।

জটিল কোন ইস্যু নয়, কৃষি বিল। কৃষি খাতে মোটা টাকা বরাদ্দ করা হবে, সবারই তা জানা। দীর্ঘ আলোচনা হলো, তবে কারও তরফ থেকে তেমন কোন জোরাল আপত্তি বা প্রতিবাদ উঠল না। ভাগ্যিস ভোটাররাও অনেকে জানে না, বরাদ্দ টাকার মোটা একটা অংশ মোটেও কৃষি খাতে ব্যয় করা হবে না। ওই টাকা দিয়ে কেনা হবে ট্রেনিং প্লেন, বেতন দেয়া হবে গোপন সৈনিকদের, সি.আই.এ. এজেন্ট বললে যাদের সহজেই চেনা

যায়।

হাত নেড়ে বিজয় সঙ্কেতের জবাব দিলেন চেয়ারম্যান। ইন্টেলিজেন্স কর্মকাণ্ড বজায় রাখার স্বার্থে অনেক সময়ই গণতান্ত্রিক বিধি-বিধানকে কাঁচকলা দেখাতে হয়। কংগ্রেস যে-সব সিদ্ধান্ত নেয় জনসাধারণ ইচ্ছে করলেই সেগুলো কি জেনে নিতে পারে, জেনে নিতে পারে বিদেশী ইন্টেলিজেন্সগুলোও। কাজেই শত্রুপক্ষের কাছে কিছু গোপন করতে হলে তার কোন রেকর্ড না রাখাই উচিত।

মেরিলিন শার্প ইশারায় জানতে চাইল, চেয়ারম্যান কি চান আরও কিছুক্ষণ থাকুক সে? মাথা নাড়লেন তিনি। ইতোমধ্যে নিজের হ্যাঁ-সূচক ভোটটা দেয়া হয়ে গেছে তার, নামের পাশে ইলেকট্রনিক বোর্ডে নাম্বারটা জ্বলে উঠেছে। প্রচুর ভোটে এগিয়ে আছে সরকারি দল, ভোট দিতে যারা বাকি আছে তারা সবাই বিরোধিতা করলেও বিলটা পাস হয়ে যাবে। বিলের ত্রুটি নিয়ে যারা সমালোচনা করেছে তাদের প্রভাবিত করার এখন আর কোন দরকার নেই।

মেরিলিন শার্পের বয়স চল্লিশ পুরো হয়নি এখনও। তরুণ মেধাবীদের নতুন যে দলটা হাউসে ঠাঁই করে নিয়েছে, সে তাদেরই একজন।

আজ রাতের মত কাজ শেষ হলেও, বাড়ি ফেরার উপায় নেই। কাঁধে আরেকটা দায়িত্ব রয়েছে, রোটাণ্ডায় যেতে হবে তাকে। হেনরি পিকেরিং যোগাযোগ করেছিল।

কোট নেয়ার জন্যে ক্লোকরূমে একবার থামল সে, পুব দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল চেম্বার থেকে। এখানে কোন মেটাল ডিটেকটর নেই, শুধু ওপরতলার গ্যালারি দরজাগুলোয় আছে। ছোট্ট এই একটা ত্রুটি রয়ে গেছে ক্যাপিটল দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থায়—হঠাৎ কোন কংগ্রেস সদস্য উন্মাদ হয়ে গেলে তাকে

ঠেকাবার কোন আয়োজন রাখা হয়নি। অবশ্য এখন পর্যন্ত সে-ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি, কংগ্রেস সদস্যদের উন্মাদনা হাউসে বিতর্কের ঝড় তোলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

গার্ডদের পাশ কাটাবার সময় হাসল মেরিলিন, ওরা সবাই তাকে চেনে। দরজার সামনে লবিইস্টদের ভিড়, ভিড়ের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়ে এলিভেটরগুলোর দিকে এগোল সে। অধিবেশন শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই, লোকজন হুড়মুড় করে বেরিয়ে আসবে। চট্ করে একবার হাতঘড়ির দিকে চোখ বুলাল সে, সোয়া এগারোটা। তার জন্যে মাত্র শুরু হলো রাত। এর আগে যতবার রোটাণ্ডায় হেনরি পিকেরিঙের সাথে দেখা করেছে সে, আলোচনা শেষ হতে ভোর হয়ে গেছে। জরুরী কোন ব্যাপার ছাড়া রোটাণ্ডায় তাকে তলব করে না ডেপুটি ডিরেক্টর।

আশপাশে আর কেউ নেই, এলিভেটরের জন্যে একা দাঁড়িয়ে আছে মেরিলিন। রোটাণ্ডা বলতে আসলে দুটো জায়গার কথা বোঝায়—গ̐ুজ আকৃতির মাথা নিয়ে ক্যাপিটলের হলরূম, অথবা আইভি স্ট্রীটের প্রাইভেট পলিটিকাল ক্লাব। নির্দিষ্টভাবে ক্লাবটাতেই যেতে বলে দিয়েছে হেনরি পিকেরিং। মেরিলিন ক্যাপিটলে কাজ করে, রোজই যায় সেখানে। ক্লাবেরও সদস্য সে, তবে ঘন ঘন যায় না।

হেনরি পিকেরিং বারবার সতর্ক করে দিয়েছে তাকে, আমাদের দেখা হবে কেউ যেন না জানে, আর, খুব সাবধানে থেকো।

আপনমনে হাসল মেরিলিন। ডেপুটি ডিরেক্টর তাকে সাবধান না করলেও পারত। সি.আই.এ. ট্রেনিং স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী নেয়া আছে তার। মাঠ-কর্মী হিসেবে পাঁচ বছর কাজ করার পর সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে অফিসার পদ নিয়ে ডেস্কে বসে। ওখানে কাজের কিছু কিছু পদ্ধতি অসন্তুষ্ট করে তোলে

তাকে। তার অভিযোগ ফেডারেল ইন্টেলিজেন্স বোর্ডকে জানায় সে, শুনানির জন্যে কংগ্রেস একটা কমিটি গঠন করে। ইন্টেলিজেন্স সাব-কমিটির সামনে মেরিলিন যে বক্তব্য রাখে, রাজনৈতিক মহলে ছোটখাট একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে সেটাও, প্রায় রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়ে সে। দু'বছর পর নিজেই কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়ায়, এবং বিজয়ী হয়। ইন্টেলিজেন্স কর্ম-পদ্ধতি সম্পর্কে তার আগ্রহ থাকায় ইন্টেলিজেন্স ওভারসাইট কমিটিতে জায়গা পেতেও তার কোন অসুবিধে হয়নি।

কেউ যদি সি.আই.এ-র সমালোচনা করে, তাকে সি.আই.এ-র এজেন্ট নিয়োগ করা সবচেয়ে নিরাপদ। গোটা ব্যাপারটা ছিল পূর্ব-পরিকল্পিত, প্রমাণ ইত্যাদি সহ লিখিত অভিযোগগুলো মেরিলিনের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিল। ইন্টেলিজেন্স সাব-কমিটি যে শুনানির ব্যবস্থা করে তার মধ্যে কোন বানোয়াট ব্যাপার ছিল না, কিন্তু মেরিলিন যে বক্তব্য রাখে সেটা তৈরি করে দেয় সি.আই.এ-র অভিজ্ঞ গবেষকরা। গোপন সরকারি ফাণ্ড থেকে টাকা পেয়ে নির্বাচনে দাঁড়ায় মেরিলিন। আসলে সি.আই.এ-র কাজ কখনও ছাড়েনি সে, আগাগোড়া করে যাচ্ছে।

এলিভেটরের একটা দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল মেরিলিন। দরজা বন্ধ হতে শুরু করল। হঠাৎ একটা লোমশ হাত ঢুকল ভেতরে, সচল দরজাটাকে মুহূর্তের জন্যে থামিয়ে দিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকল এক লোক।

চওড়া কাঁধ লোকটার, শক্ত ঘাড়। মাথায় ধূসর রঙের চুল, ম্লান নীল চোখ। মুখের বাঁ দিকে কাটা দাগ, চোখের নিচ থেকে জুলফি পর্যন্ত।

'ডানিয়েল! এখানে কি করছ তুমি?'

'তোমার সাথে কথা আছে,' শান্ত সুরে বলল ডানিয়েল। হাত

তুলে ফার্স্ট ফ্লোরের বোতামে চাপ দিল সে। 'আমার পিছু পিছু আসবে, কিন্তু মনে রেখো, আমরা একসাথে নই।'

মাথা ঝাঁকাল মেরিলিন, কোন প্রশ্ন করল না। ডানিয়েলকে চেনে সে, জানে সি.আই.এ-তে কাজ করে। ভাবল, নিশ্চয়ই গুরুতর কিছু ঘটেছে।

দোতলায় থামল এলিভেটর। খুলে গেল দরজা। মেরিলিনকে পিছনে রেখে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল ডানিয়েল। সামনে কয়েকজন গার্ডকে দেখে ঝট করে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল, তারপর হন হন করে হেঁটে বেরিয়ে গেল হলরুম থেকে।

গার্ডদের একজন চিনতে পারল মেরিলিনকে। বাউ করে পথ থেকে দ্রুত সরে দাঁড়াল, বলল, 'আজ অনেক রাত হয়ে গেল।'

'সবারই,' বলে মৃদু হাসল মেরিলিন, হলরুম পেরিয়ে এল করিডরে। সামনে, বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে ডানিয়েল। মেরিলিন ভাবল, প্রেস কার্ড, নাকি কংগ্রেশনাল আই.ডি., গার্ডদের কী কার্ড দেখাল ডানিয়েল? ল্যাংলিতে এ-ধরনের কার্ড তৈরি করা থাকে, দরকার হলেই পাওয়া যায়। দুটোর যে-কোন একটা সাথে থাকলে ক্যাপিটলে অবাধে ঘোরাফেরা করা যায়, রাত যত গভীরই হোক, লোকজন থাকুক বা না থাকুক।

বাঁক নিয়ে চওড়া একটা করিডরে চলে এল ডানিয়েল, দালানটার পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে লম্বা হয়ে আছে। পিছু পিছু আসছে মেরিলিন, মোজাইক করা মেঝেতে তার পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলল। হাউস চেম্বার থেকে একতলা নিচে রয়েছে ওরা। আশপাশে কোথাও কোন লোকজন নেই, আছে শুধু মার্বেল পাথর আর ব্রোঞ্জে তৈরি বিশাল আকারের অসংখ্য মূর্তি। মেরিলিন আন্দাজ করতে পারল, কোথায় যাচ্ছে ডানিয়েল। দালানের গভীর তলায়, ছোট একটা চেম্বারে। ক্রিপ্ট বললে সবাই

চিনবে জায়গাটা। জর্জ ওয়াশিংটনের সমাধি হিসেবে ডিজাইন করা হয়েছিল ওটার। এত রাতে ক্রিপ্টে কোন গার্ড থাকবে না।

বাঁক নিয়ে একটা দরজার সামনে থামল ডানিয়েল। দরজার ভেতর প্যাঁচানো একটা সিঁড়ি শ্যাফট ঘেঁষে নেমে গেছে নিচের সেলারে। নিজের মনে মাথা দোলাল মেরিলিন, ঠিকই আন্দাজ করেছিল সে। এর আগেও ক্রিপ্টে নেমেছে সে, ডেপুটি ডিরেক্টরের সাথে গোপনে দেখা করেছে। এমন কি লোহার গেটের একটা চাবিও আছে তার রিঙে।

প্যাঁচানো সিঁড়ি বেয়ে একটা করিডরে নেমে এল মেরিলিন, করিডরের দু'পাশে মসৃণ পাথুরে দেয়াল। এই করিডর ধরে দালানের মাঝখানে পৌঁছানো যায়। দেয়াল ঘেঁষে মোটা পাইপ, ঢাকনি মোড়া আণ্ডারড্রেন চলে গেছে সামনের দিকে। করিডরের শেষ মাথায় লোহার গেটটা।

গেটে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ডানিয়েল। গেটের ওপর সাদা রঙ করা দেয়াল খিলান আকৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভেতরটা ক্যাথেড্রালের মত দেখতে। খিলানের নিচে লম্বা কালো একটা বাক্স, ভেলভেটে মোড়া। লিংকন ক্যাটাফ্যালক, রাষ্ট্রীয় শেষকৃত্যে ব্যবহার করা হয়। এখানেই রাখা হয় ওটা।

গেটের দিকে পিছন ফিরল মেরিলিন, ডানিয়েলের দিকে মুখ তুলল। 'কি ঘটেছে?'

মুচকি একটু হাসল ডানিয়েল। শান্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন। 'কিছু না।'

'কিছু না মানে?' মেরিলিনের দুই ভুরুর মাঝখানটা কুঁচকে উঠল।

জবাব দিল না ডানিয়েল, যেন প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল। জ্যাকেটের পকেটে হাত দুটো ভরে ঘুরে দাঁড়াল সে। মেরিলিনকে পিছনে রেখে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে। শান্ত ভঙ্গি, হাঁটার মধ্যে কোন

রকম আড়ষ্ট ভাব নেই। অবাক হয়ে তার মাথার পিছনে তাকিয়ে থাকল মেরিলিন। তারপর হঠাৎ, দ্রুত আধপাক ঘুরল ডানিয়েল।

হাসল সে, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা, কিন্তু নীলচে চোখ পর্যন্ত পৌঁছুল না। মাথার ওপর থেকে আলো পড়ায় মুখের কুৎসিত দাগটাকে মনে হলো চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে। হাতের ছোট্ট অটোমেটিকটাকেও কদর্য লাগল।

আতঙ্কে আর অবিশ্বাসে পাথর হয়ে গেল মেরিলিন। 'ডানিয়েল! এ কি? কি করছ?'

হাসিটুকু স্থির হয়ে থাকল মুখে, গলার আওয়াজ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, 'নির্দেশ আছে তোমাকে আমার খুন করতে হবে।'

হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেরিলিন। জানে ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। কিন্তু ডানিয়েল! দু'জনেই ওরা সি.আই.এ. এজেন্ট!

মেরিলিনের হাত দুটো কোটের পকেটে আরও একটু ঢুকে গেল। 'হেনরি পিকেরিং তোমাকে পাঠায়নি।'

'কে পাঠিয়েছে সেটা বড় কথা নয়,' বলে সেফটি ক্যাচ নামাল ডানিয়েল, নিস্তব্ধ লম্বা করিডরে ক্লিক শব্দটা প্রতিধ্বনি তুলল। 'কেউ একজন তো নিশ্চয়ই পাঠিয়েছে। বড় কথা হলো, তোমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। জানি না কেমন লাগছে তোমার, আমার কিন্তু খারাপই লাগছে। ক্যারিয়ারের শুরুটা তুমি ভালই করেছিলে, আরও অনেক ওপরে উঠতে পারতে। আমি দুঃখিত, বিলিভ মি। কিন্তু নিয়তিকে কেউ খণ্ডাতে পারে না, বুঝলে। তবে তোমাকে আমি কয়েক সেকেণ্ড সময় দিচ্ছি, পাপ-টাপ করে থাকলে প্রার্থনা করার এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

প্রার্থনা নয়, দ্রুত কয়েকটা ঘটনার কথা স্মরণ করল মেরিলিন। অ্যারো নামে একজন লোক বার্লিনের গোল্ডেন বারে খুন হয়েছে। আরেকজন লোক, এগম্যান, মারা গেছে আফ্রিকার এক চার্চে। আজ তার পালা। এখানে, ক্যাপিটল রোটাণ্ডা থেকে

দো'তলা নিচে।

মৃদু হাসল মেরিলিন, ভান করল যেন ভয় পায়নি। 'তুমি যে একটা কী, এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছ!' পকেট থেকে বাঁ হাতটা বের করে নাড়ল সে। 'খেলনাটা সরাও এবার, অনেক হয়েছে! হেনরি পিকেরিং যদি শোনে তুমি আমার সাথে এ-ধরনের রসিকতা করেছ...'

হো হো করে হেসে উঠল ডানিয়েল। 'হলিউডে যাওনি কেন?' হঠাৎ হাসি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। 'সেখানেও তুমি প্রতিভার ছাপ রাখতে পারতে।'

এবার চোখ রাঙাল মেরিলিন। 'আমি কিন্তু চিৎকার করব, ডানিয়েল! এখনও বলছি, খেলনাটা সরাও!'

ডানিয়েলের চোখ কুঁচকে গেল, নিষ্ঠুর দৃষ্টিতে তাকাল সে। 'তোমাকে আর সময় দেয়া গেল না, মেরিলিন।' পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে দিল সে।

গুলি করল মেরিলিন।

কোটের পকেট থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল বুলেট, সোজা ঢুকে গেল ডানিয়েলের বুকে। পিস্তল পেঁচিয়ে থাকা আঙুলগুলোয় ঢিল পড়ল। মুখের ভাব বদলে গিয়ে হাস্যকর ভাঁড়ামির ভঙ্গি ফুটে উঠল। খটাখট আওয়াজ হলো মেঝেতে, অটোমেটিকটা অসাড় আঙুল থেকে খসে পড়েছে। টলছে ডানিয়েল, কিন্তু আশ্চর্য, এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। তারপর বাঁকা হতে শুরু করল তার হাঁটু।

দড়াম করে পড়ে গেল সে, এক পা পিছিয়ে এল মেরিলিন। পকেটের ভেতর খুদে পিস্তলটা এখনও ধরে আছে সে। মুখ তুলে তাকাল, নির্জন করিডর। কান পাতল, কোথাও কোন আওয়াজ নেই। ডানিয়েলের দিকে তাকাল আবার। মোজাইক করা মেঝেতে রক্তাক্ত একটা লাশ।

গুড গড! হেনরি পিকেরিংকে দরকার তার! এখুনি!

আইভি স্ট্রীটের পার্কিং লটে একটা গাড়িতে বসে রয়েছে ডেপুটি ডিরেক্টর হেনরি পিকেরিং। দেখল, ক্লাবের দরজার দিকে এগোচ্ছে মেরিলিন, চেহারায় সন্ত্রস্ত ভাব। জানালার কাঁচ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকল সে, 'মেরিলিন।'

চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরিলিন, ঘুরল, পিকেরিংকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল গাড়িটার দিকে। তার কোটের পকেটে একটা গর্ত রয়েছে, গর্তের মুখ গানপাউডারে পুড়ে গেছে। চোখ জোড়া বিস্ফারিত, সশব্দে হাঁপাচ্ছে সে। গাড়ির দরজা খোলার সময়, পিকেরিং লক্ষ করল, হাত দুটো কাঁপছে তার। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে, পিকেরিঙের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বসল সীটে।

'কি ব্যাপার, মেরিলিন?' জরুরী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল পিকেরিং।

'ডানিয়েল, মাই গড! এইমাত্র তাকে আমি খুন করেছি!'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পিকেরিং, হতভ'। 'ডানিয়েল?'

'আমাদের ডানিয়েল,' চাপা গলায় বলল মেরিলিন, কান্নায় বুজে আসছে গলা। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়ে হড়বড় করে সব ব্যাখ্যা করল সে। ক্যাপিটলে তাকে খুঁজে বের করে ডানিয়েল, ক্রিপ্টে নামিয়ে নিয়ে যায় তাকে, হঠাৎ তার দিকে রিভলভার ধরে। পিকেরিং তাকে সাবধানে থাকতে বলে দিয়েছিল, তাই না? সেজন্যেই সাথে পিস্তলটা রেখেছিল সে আজ। ভাগ্যিস! কি? হ্যাঁ, লাশটাকে ওখানেই রেখে এসেছে সে।

বিস্ময়ে বিহ্বল পিকেরিং কোন বাধা না দিয়ে শুনে গেল। মেরিলিন থামতে বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল সে, 'ডানিয়েল! কি আশ্চর্য, এত থাকতে ডানিয়েল! দুনিয়াটার হলো কি!' মেরিলিনের দিকে ফিরল সে। 'কেন, মেরিলিন? কেন? তোমাকে কিছু বলেনি

সে?’

দ্রুত মাথা নাড়ল মেরিলিন। ‘দুঃখিত, স্যার। জানি ওর মুখ থেকে কথা বের করার জন্যে...কিন্তু সময় পেলাম কোথায়! আর এক সেকেণ্ড দেরি করলে সে-ই আমাকে...’

‘বুঝেছি,’ বাধা দিয়ে বলল পিকেরিং। ‘শান্ত হও, মেরিলিন। যা করেছ ঠিক করেছ, সবচেয়ে আগে দরকার বেঁচে থাকাটা। বরং তুমি মারা গেলেই তোমার ওপর রাগ হত আমার। গুলির আওয়াজ?’

‘কেউ শোনেনি...সেলারে কেউ থাকলে তো!’

‘লাশটা তাহলে লোহার গেটের সামনেই পড়ে আছে?’

‘না-না, গেট খুলে ভেতরে নিয়ে গেছি,’ তাড়াতাড়ি বলল মেরিলিন। ‘ক্যাটাফালকের ভেতর লুকিয়ে রেখে এসেছি।’

ক্ষীণ একটু তিক্ত হাসি ফুটল পিকেরিঙের ঠোঁটে। ‘ভাল জিনিসই হাতের কাছে পেয়ে গেছে। ওর পিস্তলটা?’

‘আমার কাছে,’ পকেট থেকে অটোমেটিক পিস্তলটা বের করে দিল মেরিলিন।

‘তোমারটাও,’ বলল পিকেরিং। ‘কেউ যদি আমাদের আগে লাশের কাছে হাজির হয়, বুলেট দেখে পিস্তলের খোঁজ পেয়ে যাবে। তোমার নামে নতুন একটা ইস্যু করতে হবে।’

নিজের পিস্তলটাও হাতছাড়া করল মেরিলিন। বিশেষ অ্যাসাইনমেণ্ট ছাড়া সে অবশ্য সাথে পিস্তল রাখে না। ‘আপনি এখনও চান রোটাণ্ডায় যাই আমি?’ জিজ্ঞেস করল সে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পিকেরিং। তারপর বলল, ‘এখন আর কোন ফায়দা হবে বলে মনে হয় না, তবু একবার গিয়ে দেখা যেতে পারে। যাও, বলা তো যায় না। আমি এদিকে দেখি ফোনে জেফ রিকার্ডকে পাওয়া যায় কিনা।’

দরজার হাতলে হাত রেখে মাথা ঝাঁকাল মেরিলিন।

‘সাবধানে থেকো,’ মেরিলিনের পিঠ চাপড়ে দিল পিকেরিং।

গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ঝুঁকল মেরিলিন, পিকেরিংকে দেখল। অভয় দিয়ে হাসল পিকেরিং। বলল, ‘কোন ভয় নেই। ওখানে আমাদের অনেক লোক আছে। কেউ তোমার গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না।’

দৃঢ়, ধীর পায়ে ক্লাবের দিকে এগোল মেরিলিন।

আসলে রোটাণ্ডার এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই। ওই নামে এক সময় একটা প্রাইভেট রেস্তোরাঁ ছিল, সেটা উঠে যাবার পর জায়গাটা দখল করেছে ক্লাব। এটাও একটা প্রাইভেট ক্লাব, আলাদা একটা নামও আছে। কিন্তু ক্যাপিটল হিল-এ যারা কাজ করে, তারা রোটাণ্ডা নামটা ভুলতে পারেনি, ক্লাবটাকেও সেই পুরানো নামে ডাকে। জিজ্ঞেস করলে অনেকেই ক্লাবের আসল নাম বলতে পারবে না।

ভেতরটা অবশ্য অনেক বদলানো হয়েছে। বিশাল হলটাকে ভাগ করা হয়েছে কয়েক ভাগে। ঢোকার মুখে অস্বাভাবিক চওড়া সিঁড়ি, কারুকাজ করা কাঠের রেইলিং বসিয়ে কয়েক প্রস্থে ভাগ করা হয়েছে। দুই প্রস্থ সিঁড়ি দু’দিক থেকে উঠে গেছে প্রকাণ্ড এক ঝুল-বারান্দায়, প্রেসিডেনশিয়াল পোর্ট্রেট গ্যালারি হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। কেনেডি, জনসন, নিক্সন, ট্রুম্যান, সব ক’জন প্রেসিডেন্টের ছবিই আছে ওখানে।

ঢোকার মুখ থেকে তৃতীয় আরেক প্রস্থ সিঁড়ি নেমে গেছে নিচের দিকে। নিচে লিনেন মোড়া সার সার টেবিল, মৃদু আলো। ডিনার পর্ব শেষ হয়েছে, লোকজন যারা আছে তারা সবাই গলা ভেজাবার জন্যে আছে। বেশিরভাগই কংগ্রেশনাল স্টাফ, দীর্ঘ অধিবেশনের পর, বাড়ি ফেরার আগে, দু’এক ঢোক গিলে তাজা হয়ে নিতে চায়।

মেরিলিনকে দেখেই চিনতে পারল বারটেণ্ডার। 'হাই, মিস শার্প। বলুন কি দেব আপনাকে?'

গায়ের কোট আগেই খুলেছে মেরিলিন, ভাঁজ করে বুলেটের ফুটোটা লুকিয়ে রেখেছে। উঁচু একটা টুলে বসল সে। 'ব্র্যাণ্ডি, প্লীজ।'

'শিওর থিং।'

স্পীকার একটা গল্প শুনিয়েছিলেন, মনে পড়ে যেতে হাসি পেল মেরিলিনের। একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী শ্রমিকদের জন্যে একটা বারে পার্টির আয়োজন করেছেন। সবার জন্যে বিয়ারের অর্ডার দিলেন তিনি। বারটেণ্ডার জিজ্ঞেস করল, আপনাকে কি দেব, স্যার? প্রার্থী বললেন, স্কচ হুইস্কি। খুব স্বাভাবিক, নির্বাচনে হেরে যান ভদ্রলোক।

গ্লাস তুলে ছোট্ট একটা চুমুক দিল মেরিলিন। অনুভব করল, টেনশন কেটে গেছে তার, ঢিল পড়েছে পেশীতে। ডানিয়েলের সাথে যা ঘটে গেছে, মনে হলো অনেকদিনের পুরানো ঘটনা, তার সাথে যেন কোন সম্পর্কই নেই। তারপর উপলব্ধি করল, ঢিল পড়েনি, স্রেফ অসাড় হয়ে গেছে পেশী। উত্তেজনা বোধ করছে না, কারণ ভোঁতা হয়ে গেছে স্নায়ুগুলো। অনেক বছর হলো এ-ধরনের ব্যাপারে জড়ায়নি সে। স্পীকারের বন্ধুর মত, আরেক ধরনের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে সে।

সান্ত্বনা এইটুকু যে এখানে আর নতুন করে কিছু ঘটবে না। এত লোকের ভিড়ে কি ঘটতে পারে? তাছাড়া, আশপাশে সি.আই.এ-র বেশ কিছু এজেন্টও আছে। নিশ্চয়ই তারা সবাই ছদ্মবেশ নিয়ে আছে, তা না হলে দু'একজনকে অন্তত চিনতে পারত সে।

বারের আরেক প্রান্তে ছোটখাট একটা ভিড়, ভিড় থেকে আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল এক লোক। লোকটা হাসছে, তার

দিকে তাকিয়ে। চিনতে পারল মেরিলিন। একজন লবিইস্ট। বক বক করা অভ্যেস, তেল মাখানো স্বভাব।

গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে নিজেকে শক্ত করল মেরিলিন। অন্য এক ধরনের হামলার জন্যে তৈরি হলো মনে মনে।

রোটাণ্ডার সামনের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। মেম্বারশিপ কার্ড লাগে শুধু খাবার বা পানীয় কেনার সময়। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কর্নেল উইলিয়াম অবসন।

সিঁড়ির মাথা থেকে নিচের দিকে, বারের ভেতর তাকাল সে। তারপর বাঁদিকে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ঝুল-বারান্দায়। ঢিলেঢালা একটা রেনকোট পরে আছে সে, তাতে ঢাকা পড়েছে নিজের আকৃতি। জ্যাকেটের কলার তোলা, খাড়া হয়ে ঢেকে রেখেছে ঘাড়, হ্যাটের কিনারা প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

মেন'স রূমের দরজার দিকে এগোল সে, যেন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যেই এখানে তার উঠে আসা। কিন্তু দরজাটার পাশ ঘেঁষে এগোল, ভেতরে ঢুকল না। কাউকে দেখতে পেলে হয়তো ঢুকত, কিন্তু সিঁড়িতে বা সামনের দরজায় কাউকে দেখা গেল না।

একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অবসন। টেলিফোনের আওয়াজ শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে।

□

'আপনার ফোন, মিস শার্প,' বলল বারটেণ্ডার। 'কোটরূমের পাশের রিসিভারটা তুলতে পারেন।'

তাড়াতাড়ি টুল থেকে নেমে পড়ল মেরিলিন। নিশ্চয়ই ডেপুটি ডিরেক্টর হেনরি পিকেরিং ফোন করেছে, তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলবে। আধ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল এখানে রয়েছে সে, কিছুই ঘটেনি। লবিইস্ট লোকটা ছাড়া কেউ তার কাছে পর্যন্ত আসেনি।

লোকটা মূর্তিমান একটা আতঙ্ক। সাংবিধানিক বিধি-বিধান সম্পর্কে তার আগ্রহের সীমা-পরিসীমা নেই। একটা মুদ্রাদোষ আছে, খানিক পর পর যন্ত্রচালিতের মত আওড়ায়, আপনি এত জানেন! লোকটাকে এড়াবার সুযোগ পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে দ্রুত ফোনের দিকে এগোল। ফোনটা সিঁড়ির পাশে।

'হ্যালো?'

'মিস শার্প?' পুরুষমানুষের গলা। কিন্তু হেনরি পিকেরিং নয়।

'ইয়েস?'

উত্তরটা এল ওপর দিক থেকে, তীক্ষ্ণ বাতাস কাটার আওয়াজ। মেরিলিনের মাথার পিছনে লাগল বুলেটটা। বেরিয়ে গেল হাঁ করা মুখ দিয়ে। দাঁত, ঠোঁট, জিভ, মাড়ি—কিছু থাকল না, ওগুলোর জায়গায় বড় একটা গর্ত দেখা গেল। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত, লাল হয়ে গেল দেয়াল।

তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল একজন ওয়েট্রেসের গলা থেকে। বারে বসা লোকগুলো ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আর্তনাদ থামার পর কোথাও কোন শব্দ নেই, নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। কেউ নড়ল না।

সবাই যখন হতভ', সিঁড়ি বেয়ে ঝুল-বারান্দা থেকে তীর বেগে নেমে গেল এক লোক। ঢিলেঢালা রেনকোট পরনে, হ্যাটটা নেমে এসে মুখ ঢেকেছে। বিস্ফোরিত হলো দরজা, বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে গেল সে।

লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে সিঁড়ির দিকে ছুটল কয়েকজন লোক, তাদের পিছু নিল লবিইস্ট আর বারটেণ্ডার। লোকগুলো দরজা খুলে বেরিয়ে গেল, কিন্তু লবিইস্ট আর বারটেণ্ডার হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেরিলিনের দিকে। বাইরে একটা গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ হলো।

মেরিলিন মারা গেছে।

বাইরে অন্ধকার, লোকগুলো শুকনো মুখে ফিরে এল।
কর্নেল অবসন পালিয়েছে।

তিন

অ্যাসাইনমেন্টের প্রথম ধাপটা সাফল্যের সাথে পেরিয়ে এসেছে, কাজেই পরম স্বস্তিবোধ করল রানা। ডানিয়েলের কাছ থেকে বা ডানিয়েলের মাধ্যমে কর্নেল অবসনের কাছ থেকে কোন বিপদ সঙ্কেত আসেনি। তার মানে ফেউ হয়ে কেউ ওর পিছনে লেগে নেই।

মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করা অসম্ভব বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভেতর থেকে কৌশলে তাকে বের করে আনে রানা। প্রায় সাথে সাথেই ব্যাপারটা ধরা পড়ে যায়, সিক্রেট সার্ভিস ওকে ধাওয়া করতে শুরু করে। প্ল্যান-প্রোগ্রাম আগেই তৈরি করা ছিল, কাজেই সিক্রেট সার্ভিসকে সহজেই বোকা বানাতে পারে ও। তারপর শুধু মিশিগান থেকে নয়, টিউলিপকে নিয়ে আমেরিকা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথমে অস্ট্রিয়া, সেখান থেকে ইটালি, ইটালি থেকে গ্রীসের মূল ভূখণ্ড হয়ে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ক্রিটে পৌঁচেছে ও। প্রতি পদে ধরা পড়ার ভয় ছিল, মার্কিন প্রশাসন সবগুলো মিত্র দেশের এসপিওনাজ জগৎ আর পুলিস বিভাগকে সতর্ক করে দিয়েছে। শুধু নিত্য-নতুন কৌশল অবল'ন করে একের পর এক বাধাগুলো পেরিয়ে আসতে পেরেছে রানা। ক্রিট ছোট একটা দ্বীপ, সারাটা বছর ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগে থাকে। এখানকার মানুষ যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, কারও ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহল প্রকাশ করে না। দ্বীপে আসার

সময় পিছনে কোন চিহ্ন রেখে আসেনি রানা, কাজেই এখানে তাকে কেউ খুঁজতে আসবে না।

গাঢ় নীল ক্রিটান সাগর কড়া রোদ মেখে পারদের মত ঝলমল করছে, আর জলপাই ঝোপগুলোয় যেন এই মাত্র সবুজ এক পোচ রঙ লাগানো হয়েছে। গাছগুলোর স্থূল কাণ্ডের ফাঁকে পাথুরে উপকূলরেখা দেখতে পেল রানা, ঢেউগুলো একের পর এক তীরে ভেঙে পড়ায় সাদা ফেনায় ধোয়া হয়ে যাচ্ছে বালুকাবেলা। ঢেউয়ের একঘেয়ে, চাপা গর্জন ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। রানার ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে, সাঁতরে অনেক দূর চলে যায়, বন্ধুত্ব করে একটা ডলফিনের সাথে। কাছে এলেই সাগর ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। আপাতত ঝোঁকটা সামলাতে হলো, কারণ এখুনি ওকে চেহারা বদলাবার জন্যে আয়নার সামনে বসতে হবে।

টিউলিপের ঘুম ভাঙার সময় হয়ে এসেছে। যে-কোন মুহূর্তে ওষুধের প্রভাব কেটে যাবে।

বারান্দা থেকে তবু নড়তে ইচ্ছে করল না। সকালের হিম বাতাস পুলক এনে দেয় শরীরে। বাতাসে লেবু আর জলপাইয়ের গন্ধ, মন ভরে যায়। কিন্তু রানা জানে, সবুজের এই সমারোহ বেশিদিন থাকবে না। গ্রীষ্মের খরতাপে দগ্ধ হবে প্রকৃতি, সমস্ত রস আর রঙ শুকিয়ে যাবে।

আশা করা যায় ততদিন এখানে থাকবে না রানা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল ও। ছোট একটা দোতলা বাংলো, দেয়ালগুলো সাদা চুনকাম করা। সবগুলো জানালা চওড়া একটা পথের দিকে, পথের ওপারে জলপাই বাগান, তারপর সাগর। ফল তোলার সময় লোকজনের ভিড় লেগে থাকবে এই পথে। কিন্তু আপাতত বাড়ির চারপাশ অনেক দূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নির্জন। হেরাক্লিয়ন থেকে পুব দিকে চলে গেছে কোস্ট রোড,

সে-রাস্তা থেকে বাড়িটা অনেক দূরে।

নিচতলার একটা ঘরের আয়নার সামনে আধ ঘণ্টা বসল রানা। তারপর দোতলায় উঠে তালা খুলে টিউলিপের ঘরে ঢুকল। সাদা দেয়াল, টিউলিপের পরিচিত কিছু মানুষের ফটো আর পেইন্টিং ঝুলছে। বিছানায় শুয়ে রয়েছে মেয়েটা, একটুও নড়ছে না, গায়ে সাদা একটা চাদর। বিছানার কিনারায় বসে তার একটা হাত তুলে নিল রানা। পালস স্বাভাবিক, হার্টবিট স্বাভাবিক। বোধহয় স্পর্শ পেয়েই চোখের পাতা নড়ে উঠল টিউলিপের। বন্ধ পাতার ভেতর নড়াচড়া করছে মণি দুটো।

আরও পনেরো মিনিট পর চোখ মেলে তাকাল টিউলিপ। নড়ল না, শুধু চোখ ঘুরিয়ে কামরার চারদিকে তাকাল। তারপর পাশ ফিরল সে। বিছানায় বসা লোকটাকে চিনতে পেরে একটু উজ্জ্বল হলো চোখ দুটো।

স্যাম গ্রেসনের পরিচিত চেহারা।

মিষ্টি করে হাসল রানা, ওর চোখে স্নেহ আর আদর। 'হাই!'

টিউলিপের ম্লান চেহারায় আশ্চর্য উজ্জ্বল হয়ে ফুটল হাসিটুকু। ছোট্ট করে বলল সে, 'হাই!'

কচি মেয়েটার মাথায় একটা হাত রাখল রানা। 'লালা-লা, লা-লালা-লা-লা...,' মিশিগানে, মামা বাড়িতে, এই সুরটা সারাক্ষণ লেগে থাকত টিউলিপের ঠোঁটে।

'লালা-লালা-লা-লালা,' শূন্যস্থান পূরণ করল টিউলিপ, তারপরই দেয়ালে বাবার ফটোর দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'মিসেস কেনটারকি কোথায়?' গভর্নেসের কথাই আগে মনে পড়ল, তার কাছেই মানুষ সে, প্রায় সারাটা দিন তার সাথেই কাটে।

'দিন কয়েকের জন্যে এক জায়গায় যেতে হয়েছে তাকে। বলে গেছে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোমাকে দেখব।'

'বাড়িটা তোমার?' মা-বাবার, পরিচিত আরও লোকজনের ছবি থাকলেও, মেয়েটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে ঘরটা তার অচেনা।

'হ্যাঁ, আপাতত।'

ব্যাখ্যা হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট। বড় বড় কোমল চোখে এতটুকু সন্দেহ বা অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল না। অচেনা জায়গা আর অচেনা মানুষ দেখে অভ্যস্ত সে। মাত্র চার বছরে এত জায়গায় বেড়িয়েছে, বেশিরভাগ মানুষ সারা জীবনেও অত বেড়াবার সুযোগ পায় না। তাছাড়া, স্যাম গ্রেসন তার অপরিচিত কেউ নয়। মিসেস কেনটারকির বন্ধু। 'আমার সেই খেলনা ভাল্লুকটা?'

'নোড়ো না,' কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে চোখ রাঙাল রানা। তারপর খাটের তলা থেকে বড়সড় একটা খেলনা ভাল্লুক বের করে বিছানার ওপর রাখল। দুর্বল, তাই টিউলিপ বসতে গেলে বাধা দিল রানা। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভাল্লুকটাকে নিজের বুকের ওপর টেনে নিল টিউলিপ। আনন্দে চিক চিক করছে চোখ দুটো। হঠাৎ মনে পড়তে, রানার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সে। পাকা গিন্নীর মত বলল, 'আমাদের কিছু গোপন কথা আছে, তুমি এখন যাও।'

মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে এরকম একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। দরজার কাছে চলে গেছে ও, পিছন থেকে ডাকল টিউলিপ, 'ফ্রেণ্ড?'

পিছন ফিরল রানা। 'ইয়েস?'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ।'

হাসতে হাসতে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাতঘড়ি দেখল ও। ওয়াশিংটনে এখন রাত। হাসি মিলিয়ে গিয়ে ম্লান হয়ে গেল চেহারা। ভাবল, দিনকাল কেমন কাটছে প্রেসিডেন্ট আর ফার্স্ট লেডির?

বিছানায় পিঠ দিয়ে শুয়ে আছেন রিচার্ড কনওয়ে। প্রায় অন্ধকার ঘর। চোখ খোলা, বিছানার ওপর টাঙানো নেট ভেদ করে সিলিঙে স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি। তাঁর পাশেই শুয়ে রয়েছেন পামেলা কনওয়ে, অবশেষে শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কান খাড়া করে স্ত্রীর নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ শুনলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু তুলে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। ঘুমের মধ্যেও ফার্স্ট লেডির চেহারা থেকে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার রেখাগুলো মিলিয়ে যায়নি।

হায় ঈশ্বর, ভাবলেন প্রেসিডেন্ট, পামেলাকে আমি কি অশান্তির মধ্যেই না রেখেছি! আর টিউলিপ? আজ তার এই বিপদের জন্যে কি আমিই দায়ী নই?

বিছানা থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়লেন প্রেসিডেন্ট। কার্পেটের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে এগোলেন, থামলেন বাথরূমের সামনে এসে। ঘাড় ফিরিয়ে আরেকবার দেখে নিলেন স্ত্রীকে, পাশ ফিরে অঘোরে ঘুমাচ্ছেন পামেলা। বাথরূমে ঢুকে বোতাম টিপলেন তিনি, চোখ ধাঁধিয়ে গেল আকস্মিক আলোয়। বাথটাবের চওড়া কিনারায় বসলেন, কনুই দুটো হাঁটুর ওপর, তালুর ওপর মুখ।

হোয়াইট হাউসে এই একমাত্র জায়গা যেখানে সত্যি সত্যি নিজেকে একা অনুভব করতে পারেন প্রেসিডেন্ট—বাথরূম। ব্যাপারটা প্রায় হাস্যকর বলা চলে। কিন্তু যে-কোন দরজা খুলে বাইরে পা দিলেই দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট ছায়া হয়ে পিছু নেবে তাঁর, একা কোথাও যাওয়া হবে না।

এই মুহূর্তে একা হওয়া দরকার তাঁর, কিন্তু অন্ধকার বেডরূমে সমস্যাগুলো আরও যেন বিকট চেহারা নিয়ে গ্রাস করতে আসে তাঁকে।

চোখ বুজলেন তিনি, পুরানো দিনের কথা স্মরণ করলেন।

কংগ্রেস নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছেন তখন। ভাড়া করা ছোট একটা কামরা থেকে মুষ্টিমেয় ভলান্টিয়ারের সাহায্যে প্রচারণা চালাচ্ছেন। ভলান্টিয়ারদের মধ্যে অন্যতম ছিল পামেলা, জেফ রিকার্ড, আর মার্গারেট। সবাই তাঁর বিশ্বস্ত, পুরানো বন্ধু। ইলেকশনের রাত। বিজয়। কি আনন্দময় মুহূর্ত!

কিন্তু তখন যদি জানতেন নিয়তি কোথায় তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিন কি বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হতে পারতেন? ভাড়া করা ঘরে যা শুরু হয়েছিল, আজ এই তার পরিণতি। স্ত্রী ভয়ে সিটকে আছে। মেয়ে নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতার শিকার। প্রিয় বন্ধুকে মনে হচ্ছে অপরিচিত লোক।

আর, তিনি নিজে?

ক্লান্ত একটু হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, বাথটাবের কিনারায় বসে আছেন, একাকী, মনে তাঁর ভয় আর অপরাধবোধ, ভাবছেন ক্ষমতার লোভ করা উচিত হয়নি তাঁর, লোভ করাতেই আজ তাঁকে এত বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে।

'রিচার্ড...?' দরজার বাইরে থেকে আওয়াজ এল।

চোখ তুলে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। পামেলার ঘুম ভেঙে গেছে।

'তোমার খারাপ লাগছে?' জিজ্ঞেস করলেন ফার্স্ট লেডি।

'না।' বাথটাব থেকে নেমে দরজা খুললেন প্রেসিডেন্ট। আলোর একটা ফালি বিছানার ওপর পড়ল। বিছানায় উঠে বসেছেন পামেলা, চেহারায় চিন্তার ছাপ। 'হ্যাঁ,' সত্যি কথা বললেন এবার, 'খুব খারাপ লাগছে।'

তাড়াহুড়ো করে বিছানা থেকে নামতে গেলেন ফার্স্ট লেডি, কিন্তু তার আগেই বিছানার কাছে পৌঁছে গেলেন প্রেসিডেন্ট। স্ত্রীকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি, কাছে টানলেন—শুধু যে সান্ত্বনা আর সহানুভূতি পেতে চাইছেন তাই নয়, সম পরিমাণে

দিতেও চাইছেন।

'রিচার্ড।'

স্ত্রীর ঠোঁটে হালকা একটা আঙুল রাখলেন প্রেসিডেন্ট। 'প্লীজ কথা বোলো না, শুধু শুনে যাও।'

স্বামীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন পামেলা। তারপর মাথা ঝাঁকালেন।

'গোটা ব্যাপারটার জন্যে আমি দায়ী,' শান্তভাবে বললেন রিচার্ড কনওয়ে, পামেলা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে আবার তিনি হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন। 'ক'দিন ধরেই ভাবছি, একটা ব্যাখ্যা পাবার চেষ্টা করছি। একটু আগে হঠাৎ আমার উপলব্ধি হলো। শোনো, তোমাকে তাহলে সব বলি... ।'

গাড়ি চালিয়ে সরাসরি ল্যাংলিতে চলে এল হেনরি পিকেরিং, জানতে পারল জেফ রিকার্ড বাড়ি চলে গেছেন। সাথে সাথে ফোন করল সে, রিসিভার তুলল মার্গারেট। জেফ রিকার্ড এখনও বাড়ি ফেরেননি। নিশ্চয়ই ফেরার পথে রয়েছেন। 'ফিরলেই আমাকে টেলিফোন করতে বলবেন,' ভারী গলায় বলল সে, নামিয়ে রাখল রিসিভার।

সময়ের দিকে অস্থির একটা চোখ রেখে অন্যান্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল পিকেরিং। ক্যাপিটল ক্রিপ্টে, লিংকন ক্যাটাফালকে লাশ রয়েছে ডানিয়েলের। সত্যি, অদ্ভুত একটা ব্যাপার! সি.আই.এ. হিরোরা মারা যাবার পর উপযুক্ত সম্মান প্রায় কখনোই পায় না। সি.আই.এ. ভিলেনদের তো প্রশ্নই ওঠে না।

গোটা ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে শুধু অসন্তুষ্ট নয়, রাগে কেঁপে উঠল পিকেরিং। মৃত একজন এজেন্টের এক কানাকড়ি মূল্য নেই।

ফোনের দিকে হাত বাড়াল সে। হেডকোয়ার্টারের ভেতরই

দু'জায়গায় ফোন করল। ক্যাপিটলের মত পুরানো একটা বিল্ডিঙের মেরামতের কাজ সব সময় লেগে থাকে। এক দল রঙ মিস্ত্রীকে দেখে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না, সাথে যদি সরকারি জব অর্ডার আর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ভরা একটা ঠেলাগাড়ি থাকে। কেউ জানবে না ডানিয়েল ওখানে কখনও ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হবে কাজটা। একটা দিক সামলানো গেল।

ইতোমধ্যে ডানিয়েলের ফাইল পৌঁছুল ডেস্কে। সতর্কতার সাথে পড়ল পিকেরিং। ফাইলে এমন কিছু নেই যা মেরিলিন শার্প বা টিউলিপের সাথে ডানিয়েলকে জড়াতে পারে। ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল সে, পায়চারি শুরু করল।

এখনও বাজছে না ফোন। জেফ রিকার্ড করছে কি? কোথায় গেল সে?

হঠাৎ নক হলো দরজায়। ঝট্ করে ঘুরল পিকেরিং। 'কাম ইন।'

নিচের তলা কমিউনিকেশন রুম থেকে একজন মেসেঞ্জার। সীল করা একটা এনভেলাপ দিয়ে চলে গেল সে। এনভেলাপটা নেড়েচেড়ে দেখল পিকেরিং। লাল এনভেলাপ, তারমানে আলট্রাআর্জেন্ট। লেখা আছে শুধু তার দেখার জন্যে। এনভেলাপ ছিঁড়ে ভেতরের টেলেক্সটা রুদ্ধশ্বাসে পড়ে গেল সে। পরমুহূর্তে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল রিসিভার, আবার ফোন করল সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের বাড়িতে।

'দুঃখিত,' বলল মার্গারেট। 'এখনও ফেরেনি ও। বুঝতে পারছি না কেন এত দেরি করছে। কোথায় আছে তাও আমার জানা নেই... ।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল পিকেরিং। হাতের টেলেক্সটা আরেকবার দেখল। তারপর টেলিফোনের সাথে সংযুক্ত স্ক্র্যা'লারের সুইচ অন করল। 'শুনুন, মিসেস রিকার্ড, ওনাকে

বলবেন আমার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব হলো না। এথেন্স থেকে আমরা একটা টেলেক্স পেয়েছি। একজন মেয়ে এজেন্ট খবর দিয়েছে, সে নাকি টিউলিপকে দেখেছে।'

'টিউলিপকে দেখেছে! কোথায়? কখন?'

'সব কথা ব্যাখ্যা করার সময় নেই, দুঃখিত। ওনাকে বলবেন, টেলেক্সটা আমার সেফে থাকল। এখানে এসে ওটা পড়তে বলবেন। বলবেন, এথেন্স যাচ্ছি আমি।'

'আজ রাতে?'

'এখুনি। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে যদি তিনি বাড়িতে ফেরেন, এনড্রুতে গেলে আমার সাথে দেখা হবে। তা না হলে গ্রীস থেকে ফোনে কথা বলব আমি।'

'ঠিক আছে।'

'আরও একটা ব্যাপার,' বলল পিকেরিং। 'ওনাকে বলবেন, মেরিলিন শার্পকে রোটাণ্ডায় রেখে এসেছি আমি। অনেক কথা বলার আছে তার। স্ক্র্যা'লারেও সে-সব কথা আপনাকে বলা যাচ্ছে না। মি. রিকার্ডের সাথে আপনার দেখা হোক বা তিনি আপনাকে ফোন করুন, বলবেন এক মুহূর্ত দেরি না করে মেরিলিনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। ওনার জন্য একটা ফাইল থাকল এখানে। টেলেক্সের সাথে সেফে রেখে গেলাম।'

'ঠিক আছে।'

'ধন্যবাদ,' শুভরাত্রি না জানিয়েই যোগাযোগ কেটে দিল পিকেরিং।

মেরিলিন শার্প সম্পর্কে কারও কাছ থেকে কিছু শোনার দরকার নেই জেফ রিকার্ডের। তার সম্পর্কে পিকেরিং মার্গারেটকে যা বলেছে, তিনি আরও অনেক বেশি জানেন। জানেন মেরিলিন বেঁচে নেই।

পুরানো রোটাণ্ডা থেকে বেশ খানিক দূরে নিজের গাড়িতে বসে আছেন তিনি। রোটাণ্ডায় এই মুহূর্তে গিজগিজ করছে পুলিস। পুলিস আর সাংবাদিক। ঘটনা তো আর সামান্য নয়–অভিজাত ক্লাবে কংগ্রেস সদস্যা খুন, সামনের দরজা দিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর পলায়ন–আলোড়ন তোলার জন্যে যথেষ্ট।

কিন্তু আরও আছে। কংগ্রেস সদস্যার কোটে বুলেটের একটা ফুটো, ফুটোর চারধারে গান পাউডার। বোঝাই যায়, কোটের ভেতর থেকে গুলি করা হয়েছিল। আজ রাতে। অথচ পিস্তল বা রিভলভার কিছুই পাওয়া যায়নি। বারের সামনে, একটা টুলের ওপর ভাঁজ করা অবস্থায় পাওয়া গেছে কোটটা। ওটা যে মেরিলিনের, অনেকেই সাক্ষী দিয়েছে।

প্রশ্ন ওঠে, ক্লাবে আসার আগে কোথায় ছিল মেরিলিন শার্প? পুলিস জানতে চাইবে।

তিনিও জানতে চান।

পাশের সীটে বসা লোকটার দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। এ সেই লবিইস্ট, ক্লাবে শেষবার যে কথা বলেছে মেরিলিনের সাথে। লোকটার স্ত্রী আছে, চার মেয়ে আছে। বড় মেয়ের বয়স পঁচিশ। অথচ গোপনে ভালবাসে তেইশ বছরের এক যুবতীকে। আলাদা একটা অ্যাপার্টমেণ্ট ভাড়া করে রেখেছে তাকে। হপ্তার পাঁচটা দুপুর এই যুবতীর সাথে ঘুমায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের এ-ধরনের দুর্বলতা সম্পর্কে খবর রাখতে হয় সি.আই.এ-কে। মাঝে মধ্যে এ-সব তথ্য কাজ দেয়, এই যেমন আজ রাতে। জেফ রিকার্ড উপলব্ধি করেছিলেন, রোটাণ্ডায় তাঁর নিজের একজন লোক থাকা দরকার, যে শুধু একা তাঁর কাছে রিপোর্ট করবে। গোপন তালিকায় চোখ বুলিয়ে লবিইস্ট লোকটাকে বেছে নেন তিনি। লোকটা জানে, সি.আই.এ. চীফ কোন নির্দেশ দিলে শুনতে হবে তাকে, তা না হলে তার গোপন অভিসারের কথা চাপা থাকবে

না।

'ক্লাবে আসার আগে কোথায় ছিল, আপনাকে বলেনি সে?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লবিইস্ট। 'এ-ব্যাপারে কথা হয়নি। সম্ভবত ফ্লোরে ছিলেন। অধিবেশন চলেছে এগারোটা পর্যন্ত।'

'এগারোটার পর আরও কিছুক্ষণ অধিবেশন চলে,' বললেন জেফ রিকার্ড। এরইমধ্যে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন তিনি। 'আপনি বললেন, প্রায় মাঝরাতের দিকে ক্লাবে আসে সে। মাঝখানের সময়টা কোথায় ছিল?'

'কি জানি। হয়তো তার অফিসে।' ঢোক গিলল লবিইস্ট।

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকালেন সি.আই.এ. চীফ। লোকটা ভয়ে কুঁকড়ে আছে, মিথ্যে বলবে না। 'ঠিক আছে, এবার আপনি যেতে পারেন।'

লবিইস্টের চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠল।

'কিন্তু আমাদের চুক্তির কথাটা ভুলবেন না যেন,' সাবধান করে দিলেন জেফ রিকার্ড, বলতে চাইলেন তাদের এই সাক্ষাৎকারের ঘটনা যেন প্রকাশ না পায়, পেলে গোপন অভিসারের কথা ফাঁস হয়ে যাবে।

'জ্বী, ভুলব না।'

'ভুললে নিজের পায়ে কুড়োল মারবেন। এ-ব্যাপারে আমার আগ্রহ আছে তা যদি প্রকাশ পায়, আপনার ফাইল ডাকযোগে আপনার স্ত্রীর হাতে পৌঁছে যাবে। আপনি যাতে আর কাজ করতে না পারেন সেদিকটাও দেখব আমি।'

লবিইস্ট কয়েক সেকেণ্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ি থেকে নেমে গেল। ক্যাপিটল হিলের দিকে, অন্ধকারে হারিয়ে গেল লোকটা। গাড়ি স্টার্ট দিলেন জেফ রিকার্ড।

উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়ি চালাচ্ছেন তিনি, নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই। একা থাকা দরকার কিছুক্ষণ, কয়েকটা ব্যাপার গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার।

অ্যারো আর এগম্যানের মত, মেরিলিন শার্পও মারা গেল। এবারও কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে রোটাণ্ডায় উপস্থিত ছিল খুনী। মেরিলিন কখন রোটাণ্ডায় যাবে জানল কিভাবে? নিশ্চয়ই কেউ তাকে আগেভাগে জানিয়েছে। কে জানাতে পারে? এমন একজন, যে নিজে জানে। উঁচু পদের কোন লোক, ভাবলেন জেফ রিকার্ড, যারা আমার আশপাশে রয়েছে তাদের কেউ। মাই গড, সি.আই.এ-র ভেতর দু'মুখো সাপ!

চিন্তার খেই ধরে আবার তন্ময় হলেন জেফ রিকার্ড। মেরিলিন ক্লাবে যাচ্ছে, কে কে জানত? তিনি জানতেন। তিনি আর পিকেরিং প্ল্যানটা তৈরি করেন। হ্যাঁ, পিকেরিং জানত। আর জানতেন প্রেসিডেন্ট। জেফ রিকার্ড নিজে তাঁকে রিপোর্ট করেছিলেন।

মেরিলিনকে রোটাণ্ডায় পাঠাবার আগে সবরকম সাবধানতা অবল'ন করা হয়েছিল। জেফ রিকার্ডের পরিষ্কার নির্দেশ ছিল, সন্দেহের ঊর্ধ্বে তিনজন লোক ছাড়া কেউ জানবে না মেরিলিন কখন রোটাণ্ডায় যাচ্ছে।

অথচ খুনী ঠিকই জেনে ফেলে। সময়মত সেখানে উপস্থিত ছিল সে। ঠিক যখন তার থাকা দরকার।

সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ডের মাথা ঘুরে উঠল। উইণ্ডস্ক্রীনের সামনে আলোগুলো চোখের সামনে নাচছে। বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গের মত একটা চিন্তা বাড়ি খাচ্ছে খুলির ভেতর দিকের দেয়ালে। শুধু ওয়াশিংটনে নয়, পশ্চিম জার্মানী আর দক্ষিণ আফ্রিকাতেও খুনীকে তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে।

এবং দু'জনের একজন বেঈমান।

হয় পিকেরিং, নয়তো রিচার্ড কনওয়ে!

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে গাড়ি থামালেন জেফ রিকার্ড। এ-ধরনের উল্লট চিন্তা মাথায় এল বলে নিজেকে তিনি ধিক্কার দিলেন না। এমন একটা পরিস্থিতি, ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে বাতিল করার উপায় নেই।

জোরে একটা ঝাঁকি খেয়েছেন জেফ রিকার্ড, হুইলের সাথে ঠুকে গিয়ে ফুলে উঠেছে কপাল। কিন্তু তিনি কোন ব্যথা অনুভব করলেন না। চিন্তার ঝড় বয়ে চলেছে মাথার ভেতর। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সাহায্য করছেন কিডন্যাপারদের? তারমানে কি নিজের মেয়েকে তিনিই কিডন্যাপ করার অনুমতি দিয়েছেন? অসম্ভব! কিন্তু পিকেরিং? তাই বা কিভাবে সম্ভব! সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার সাথে জড়িত? কাজটা কেন সে করতে যাবে? কাজটা করে কি তার লাভ? দু'জনের কারই বা কি লাভ?

ধীরে ধীরে আবার গাড়ি ছাড়লেন তিনি। মাথার ভেতর সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে। পাঁজরের গায়ে হাতুড়ির বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। এ-ধরনের উন্মাদ-করা সমস্যায় আগে কখনও পড়েননি তিনি। সমস্যাটা ভীতিকর নয়, আর সব সমস্যার মত এটারও তিনি মীমাংসা করার যোগ্যতা রাখেন। ভীতিকর হলো সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলো।

গভীর একটা শ্বাস টানলেন তিনি। ঠিক আছে, যুক্তি দিয়ে চিন্তা করা যাক।

'রিচার্ড কনওয়ে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। নিখোঁজ টিউলিপের বাবা। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে কি...?'

কিসের যুক্তি? যুক্তির এখানে নেতিবাচক ভূমিকা হয় কি করে? না, রিচার্ড কনওয়ে বাদ। প্রেসিডেন্ট...অসম্ভব! তাহলে নিশ্চয়ই পিকেরিং।

লাল আলোর সামনে গাড়ি থামালেন জেফ রিকার্ড। কয়েক মুহূর্ত শুধু গাড়ি নয়, তাঁর মাথাও নিশ্চল হয়ে থাকল। ভেতরটা যেন ফাঁকা হয়ে গেছে।

সবুজ বাতি জ্বলল। গাড়ির সাথে সাথে সচল হলো ব্রেন। বোধহয় কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম পেয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে মাথাটা। কিভাবে কি ঘটেছে তিনি যেন তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। সম্পূর্ণ নতুন একটা দিক ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে শুরু করল। সেই সাথে প্রশ্ন জাগল মনে, চীফ হয়ে সি.আই.এ-র কতটুকু তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন?

হ্যাঁ, তিনি ডিরেক্টর বটে, কিন্তু ভেতরের লোক বলতে যা বোঝায় তা নন। সি.আই.এ. ডিরেক্টরকে প্রেসিডেন্ট বাইরে থেকে নিয়োগ করেন। ঠিক সেভাবেই তাঁকেও নিয়োগ করা হয়েছে। কারণ আর কিছুই নয়, হোয়াইট হাউস তাঁর বিশ্বস্ততা সম্পর্কে নিশ্চিত, তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। এবং, প্রেসিডেন্ট তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। কিন্তু যেহেতু তিনি ভেতরের লোক নন, ল্যাংলিতে কি ঘটছে না ঘটছে সব খবর তাঁকে জানানো হয় না। তিনি শুধু নীতি নির্ধারণ করে দেন, তাঁকে শুধু রিপোর্ট দেখতে দেয়া হয়। কাজের খুঁটিনাটি দিক সম্পর্কে কিছুই তিনি জানেন না, কাজগুলো যারা করে তাদের খুব কম লোককেই তিনি চেনেন। কাগজে কলমে তিনি ডিরেক্টর, কিন্তু ভেতরের লোক তিনি হতে পারেননি।

আর পিকেরিং? না, সে বাইরের লোক নয়। সে একজন প্রফেশনাল, ধাপে ধাপে ওপরে উঠে এসেছে। সংস্থাটাকে এমনভাবে চেনে সে, সেভাবে কোনদিনই জেফ রিকার্ডের পক্ষে চেনা সম্ভব হবে না। প্রেসিডেন্ট আসেন এবং যান, সেই সাথে আসে আর যায় তাঁদের নিয়োগ করা ডিরেক্টররা। কিন্তু পিকেরিঙের মত প্রফেশনালরা রাজনৈতিক পালাবদলের পরও যার যার জায়গায় থেকে যায়। সি.আই.এ-র অন্যান্য প্রফেশনালদের

কাছে পিকেরিং হলো সত্যিকার কর্তা, তাদের বিশ্বস্ততা একমাত্র পিকেরিং-ই অর্জন করতে পেরেছে।

পিকেরিং, হ্যাঁ, পিকেরিং। সে-ই সি.আই.এ-কে পরিচালনা করে।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সাউথওয়েস্ট ফ্রিওয়ে-তে চলে এলেন জেফ রিকার্ড, ডান দিকের রাস্তায় থাকলেন। রাস্তায় আরও অনেক গাড়ি রয়েছে, চারপাশে শহরের ঝলমলে আলো। জেফারসন মেমোরিয়ালে এত রাতেও কিছু ট্যুরিস্টকে দেখা গেল। অথচ নিজেকে সম্পূর্ণ একা, পরিত্যক্ত, নিঃসঙ্গ মনে হলো তাঁর। লোকে জানে, তাঁর ক্ষমতার অন্ত নেই। একদিকে সি.আই.এ-র ডিরেক্টর, আরেক দিকে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টের বন্ধু। কিন্তু ক্ষমতার দুটো উৎসই যেন কেড়ে নেয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। পিকেরিং কি করছে জানতে হবে তাঁকে, অথচ সাহায্যের জন্যে প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার উপায় নেই তাঁর। অন্তত এখুনি নয়, যতক্ষণ না জানতে পারছেন রিচার্ড কনওয়ে ব্যাপারটার সাথে জড়িত নন। শুধু কি তাই, পিকেরিং বা প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ লোকজনদের কাছ থেকেও কোন সাহায্য তাঁর নেয়া চলে না।

উপায় তাহলে একটাই থাকল। বাইরে থেকে সাহায্য নিতে হবে তাঁর। পটোম্যাক পেরিয়ে এলেন তিনি। উত্তর দিকে যাচ্ছেন। কিছু চিন্তা না করেই ল্যাংলির দিকে গাড়ি ছোটালেন, যেখানে তাঁর এই মুহূর্তে যাওয়া চলে না।

পিকেরিঙের সাথে কথা বলবেন তিনি।

ক্রিস্টাল সিটিতে পৌঁছুলেন, ফিলিং স্টেশন বন্ধ হয়ে গেছে। স্টেশনের চারদিক ফ্লাডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আলোর পিছনে ফোন বুদ, এক কোণে।

সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন তিনি।

'দুঃখিত, স্যার,' ডিউটি অফিসার বলল। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট

আগে বেরিয়ে গেছেন ডেপুটি ডিরেক্টর। বলে গেছেন, আপনি এলে বা ফোন করলে আপনাকে বলতে বাড়িতে রিঙ করুন... ।'

মার্গারেটের সাথে যোগাযোগ করতে হবে? কেন?

আবার ডায়াল করলেন জেফ রিকার্ড।

'জেফ, কোথায় তুমি?' অপরপ্রান্ত থেকে উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল মার্গারেট।

'কোথায় সে-কথা জানার দরকার নেই,' বললেন তিনি। 'পিকেরিং আমার জন্যে কোন মেসেজ রেখে গেছে?'

'লাইন কি নিরাপদ?'

'হ্যাঁ, আমি একটা ফোন বুদ থেকে বলছি। তবে ওদিকের স্ক্র্যা'লার অন করো।'

কয়েক মুহূর্ত কোন শব্দ হলো না। তারপর মার্গারেট যখন কথা বলল, ফাঁপা শোনাল তার কণ্ঠস্বর। স্ক্র্যা'লার কাজ করছে। তবে মার্গারেটের গলার উত্তেজনা ঠিকই টের পাওয়া গেল। 'তোমাদের একজন এজেন্ট টিউলিপকে এথেন্সে দেখেছে!' বলল সে। 'এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে পিকেরিং।'

'পিকেরিং রওনা হয়ে গেছে!'

'দু'বার তোমার খোঁজে ফোন করেছিল সে। আমাকে বলল, তার পক্ষে আর দেরি করা সম্ভব নয়। এথেন্স থেকে একটা টেলেক্স পেয়েছে সে, তার সেফে রেখে গেছে তোমার জন্যে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন জেফ রিকার্ড। মিলছে কি? মিলছে না কেন?

'কোথাও কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, জেফ?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন জেফ রিকার্ড। 'আর কি বলল পিকেরিং?'

'বলল, মেরিলিন শার্পের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তোমাকে—ইমিডিয়েটলি। পুরানো রোটাণ্ডায় পাওয়া যাবে তাকে।

নাম্বারটা খুঁজে দেব?'

শুকনো গলায় জেফ রিকার্ড বললেন, 'না, তার দরকার নেই।'

'কিছু একটা হয়েছে,' বলল মার্গারেট। 'তুমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছ।'

'বলো, কিছু হতে বাকি নেই,' জবাব দিলেন জেফ রিকার্ড। 'জানি না কখন বাড়ি ফিরতে পারব, তবে চিন্তা কোরো না।'

'জেফ...?'

কিন্তু মার্গারেটের কথা জেফ রিকার্ড শুনতে পেলেন না, রিসিভার নামিয়ে রেখেছেন। ফোন বুদে দাঁড়িয়ে চিন্তায় ডুবে গেলেন তিনি। মনে মনে একটা প্ল্যান তৈরি করছেন। ভয়ঙ্কর একটা প্ল্যান।

একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। পিকেরিং যাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের কারও সাহায্য তিনি নেবেন না। তারমানে গোটা সি.আই.এ-কে এড়িয়ে চলতে হবে এখন।

কি নির্মম পরিহাস, সি.আই.এ-র ডিরেক্টর সি.আই.এ-কে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

বিপজ্জনক একটা প্ল্যান তৈরি হলো, কিন্তু ঝুঁকিটা প্রকাণ্ড। তিনি উপলব্ধি করলেন, এ-ছাড়া তাঁর কোন উপায়ও নেই। রিসিভার তুলে আবার তিনি আরেক ন'রে ডায়াল করলেন।

অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল মিখাইল পোলোনভ। ওয়াশিংটন, সোভিয়েত দূতাবাসের ভাইস কনসালের অ্যাসিস্ট্যান্ট সে। তার আরও একটা পরিচয়, আমেরিকায় কে.জি.বি-র সিনিয়র আবাসিক অফিসার।

চার

এথেন্স ফ্লাইট থেকে সবার আগে নামল হেনরি পিকেরিং। অফিশিয়াল পাসপোর্ট দেখিয়ে প্রায় সাথে সাথে কাস্টমস আর এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পেরিয়ে এল। টার্মিনাল ভবনের বাইরে তার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছিল। ড্রাইভার সি.আই.এ. স্টেশন চীফ নয়, পদস্থ ল্যাংলি অফিসারের সাথে প্রকাশ্যে দেখা করবে না সে। একই কারণে যে মেয়ে-এজেন্ট টিউলিপকে দেখেছে তারও আসার কথা নয়।

কুইন সোফিয়া স্ট্রীটে মার্কিন দূতাবাস, গাড়ি দিয়ে সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে ড্রাইভারকে। নেহাতই ড্রাইভার, এসপিওনাজ সম্পর্কে বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানে না। টার্মিনাল ভবনে, ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে পিকেরিঙের সাথে হাঁটতে শুরু করল সে। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দেখাল, বলল, 'বাইরে গাড়ি আছে, স্যার।'

কালো একটা পন্টিয়াক, উজ্জ্বল রোদে ঝকঝক করছে। আশপাশে আরও কয়েকটা গাড়ি দেখল পিকেরিং। দুটো বাস, একটা লিমুসিন, তিনটে মাইক্রোবাস, ডজন দুয়েক প্রাইভেট কার। টার্মিনাল ভবন থেকে ভিড় করে বেরিয়ে আসছে লোকজন,

ঢুকছেও বহু লোক। হঠাৎ একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেল সে।

হাঁটার গতি শ্লথ হলো না, চোখে ফুটল না এতটুকু বিস্ময়। ড্রাইভার দরজা খুলে ধরল, পিছনের সীটে চড়ল সে। ঘুরে সামনে চলে গেল ড্রাইভার, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। স্টার্ট নিল গাড়ি। টার্মিনাল চত্বর থেকে রাস্তায়, যানবাহনের সচল জটলায় বেরিয়ে এল। হেলান দিয়ে বসে থাকল পিকেরিং, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না। তার দরকারও নেই, কারণ রিয়ার ভিউ মিররে ধূসর মার্সিডিজটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে।

এথেন্স ধূসর রঙের মার্সিডিজ মানেই ট্যাক্সি। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে অনেকগুলোই ছিল। পিছু পিছু একটার আসার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু আরোহী সেই পরিচিত লোকটা। শ্লাভিক অবয়ব, মুখের গড়ন অস্বাভাবিক চওড়া। লোকটা নিজেই ট্যাক্সি চালাচ্ছে।

সারটভ!

সামনের দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারের সাথে কথা বলল পিকেরিং। 'পিছনের ট্যাক্সিটাকে দেখছ?'

রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল ড্রাইভার, তারপর আবার সামনের রাস্তায়। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে।

'ওটাকে খসাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল পিকেরিং।

'ইয়েস, স্যার।'

'তাহলে দেরি কোরো না।'

অশুভ চেহারার কালো মেঘ আর হিম কুয়াশাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে বসন্ত যেন হঠাৎ করে পিছিয়ে গেছে। বছরের এই সময়ে, দিনের বেলা, এমন অন্ধকার ভাব ওয়াশিংটনে কখনও দেখা যায় না।

হাতঘড়ি দেখলেন জেফ রিকার্ড। বিকেল পাঁচটা। ফুটব্রিজটা

মাটি আর পাথর দিয়ে তৈরি, ভার্জিনিয়া আর পেনিনসুলা টেডি রুজভেল্টকে এক করেছে। তিনি জানেন, সূর্যাস্তের সাথে সাথে পার্ক বন্ধ করে দেয়া হয়–ইউ.এস. পার্ক সার্ভিসের নির্দেশ তো আছেই, পটোম্যাক নদীর জোয়ারও একটা কারণ। উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই, এখানে তাঁর রাত কাটাতে হবে না। দু'চার মিনিট আলাপ করে চলে যাবেন।

ব্রিজ পেরিয়ে এলেন সি.আই.এ. চীফ। দু'পাশে ঘন ঝোপঝাড়, আর আকাশ ছোঁয়া গাছপালা, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। খানিকদূর সামনে ফাঁকা একটা জায়গা, ওল্ড রাফ রাইডারের বিশাল ব্রোঞ্জ মূর্তি কালচে আকাশে মাথা উঁচু করে রয়েছে, মূর্তির চারধারে চওড়া পাথুরে চাতাল। মূর্তিটাকে পাশ কাটিয়ে, চাতাল পেরিয়ে বনভূমির ভেতর ঢুকলেন জেফ রিকার্ড।

কারও সাথে তাঁর দেখা হলো না। এই রকম আবহাওয়ায় দেখা হওয়ার কথাও নয়। তবু পথটার দু'দিকেই একটা তীক্ষ্ণ চোখ রেখে ঘন ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। তাঁর পিছন থেকে, ছোট্ট একটা ডাল ভাঙার আওয়াজ হলো।

জেফ রিকার্ড ফিরলেন, হ্যাঁ, মিখাইল পোলোনভ। পরনে বিজনেস স্যুট, ওভারকোটের কলার তুলে ঘাড় ঢাকা দিয়ে রেখেছে। তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন, কি ভাবছে বোঝার কোন উপায় নেই, তবে মুখের চেহারা থমথম করছে। দ্রুত পায়ে তার দিকে এগোলেন জেফ রিকার্ড। 'বলুন?'

'সাধ্যমত করেছি আমি,' পোলোনভ বলল। 'ইউরি সারটভকে পিকেরিঙের ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম। ইউরোপে সারটভ আমাদের সেরা।'

'তারপর?'

পোলোনভ এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। 'আপনার পিকেরিং ঘাস খায় না। সারটভকে খসিয়ে দিয়েছে।'

'ইউরোপের সেরা, আপনাদের সারটভ?'

'এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।' কাঁধ ঝাঁকাল পোলোনভ। 'কেউ কারও চেয়ে কম যায় না, দু'জনেই সমান চতুর।'

'কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন কেন, পিকেরিং মাঠ থেকে অনেক দিন হলো অবসর নিয়েছে। আপনার রিপোর্ট আমাকে হতাশ করল, কমরেড পোলোনভ।' জেফ রিকার্ড তার দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকালেন। 'পিকেরিংকে আমার পেতেই হবে!'

আড়ষ্ট একটু হাসল পোলোনভ। 'ঠিক এই পর্যায়ে ব্যাপারটা একটু অযৌক্তিক দেখায় না?'

'আপনার কোন ধারণা নেই প্রয়োজনে কতটা অযৌক্তিক আমি হতে পারি,' কঠিন সুরে জবাব দিলেন জেফ রিকার্ড। হতাশায় পিছন ফিরলেন তিনি। সারটভ যদি ওদের সেরা এজেন্ট হয়ে থাকে, তাহলে আর আশ্চর্য কি পিকেরিং তাকে দেখামাত্র চিনতে পারবে। পোলোনভের দিকে ফিরলেন তিনি। হঠাৎ করেই নতুন একটা চিন্তা তাঁকে রীতিমত ধাক্কা দিল। একটার পর আরেকটা। সবগুলো খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি, পোলোনভকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেছে দৃষ্টি।

এখন তিনি জানেন টিউলিপ কনওয়েকে কিডন্যাপ করার হুকুম কে দিয়েছিল। তাঁর মনে হলো, কারণটাও তাঁর জানা। শুধু তাই নয়, টিউলিপ কোথায় আছে তাও তিনি আন্দাজ করতে পারলেন।

টিনের কৌটা আর কাগজের প্যাকেট খুলে টিউলিপের প্রিয় খাবারগুলো এক এক করে বের করল রানা। ক্যাণ্ডি, পীনাট বাটার, আইসক্রীম, স্যাণ্ডউইচ, পাইনঅ্যাপল জুস, স্ট্রবেরি, পনির, আর দুধ। কোমরে হাত রেখে সব দেখল টিউলিপ, তারপর মন্তব্য করল, 'তুমি দেখছি আমাদের মার্কেটিং অফিসারের

চাকরিটা খাবে, মি. গ্রেসন। এত ভাল বাজার করতে পারো।'

বেদম হাসি পেল রানার। এত থাকতে টিউলিপ ওকে বাজার সরকার ভাবল। তবে মেয়েটাকে যতই দেখছে ও, ততই বিস্মিত হচ্ছে। কে বলবে মাত্র চার বছর বয়স, কথা শুনে মনে হবে পাকা বুড়ি। তবু তো মেয়েটার প্রাণচাঞ্চল্য এখনও পুরোপুরি ফিরে আসেনি।

শেষ প্যাকেটটা খুলল রানা। টিউলিপের চোখ কৌতূহলে জ্বলজ্বল করছিল, প্যাকেট খোলা হতে প্রায় আঁতকে উঠল সে, এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'ওমা, কি ওটা?'

হেসে উঠল রানা। 'অক্টোপাস। এক কামড় চলবে নাকি?'

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল টিউলিপ। 'শুধু আব্বা খুব পছন্দ করেন, আর কেউ আমরা ছুঁয়েও দেখি না।'

'এসো, বসো,' প্যাকেটের ভেতর অক্টোপাস ভরে রেখে বলল রানা। 'তোমাকে খাইয়ে তারপর আমি খাব।'

'ইস, আমি যেন কারও হাতে খাই!' সগর্বে বলল টিউলিপ। 'সেই যখন থেকে হাঁটতে শিখেছি তখন থেকে নিজের হাতে খাই আমি।' এগিয়ে এসে চেয়ারটায় বসল সে। 'নাও, তুমি শুরু করো।'

মেয়েটাকে নিয়ে কোন ঝামেলাই হচ্ছে না রানার। অচেনা একটা বাড়িতে রানার সাথে একা আছে, আপনজনদের কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, অথচ তবু কোন প্রশ্ন বা কান্নাকাটি নেই। সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এ-ধরনের অচেনা পরিবেশে প্রায়ই থাকতে হয় তাকে, এবং রানার আন্তরিক যত্ন তার মন জয় করে নিয়েছে।

একটা সময় বোধহয় সব পুরুষের জীবনেই আসে যখন সন্তানের পিতা হবার সাধ জাগে মনে। সাধ জাগলেও, সেটা পূরণ হবার সম্ভাবনা আপাতত রানার জীবনে নেই। ওর মনে হয় বটে,

সোহানাকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে ভালবাসে ও, কিন্তু বিয়ের কথা উঠলেই চারদিক থেকে কতরকম দ্বিধা, ভীতি, আশঙ্কা, সংশয়, সংকোচ, অনীহা, ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আসল সমস্যা, ওর এই পেশা। হঠাৎ যদি মারা যায় ও? যে-কোন মুহূর্তে যেতে পারে। খুব ভাল করেই জানা আছে, তারপর বাকিটা জীবন বিধবা হয়ে কাটিয়ে দেবে সোহানা, আর কোন পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না পর্যন্ত। সমস্যা আরও আছে। বাঁধনে জড়ালে এই স্বাধীন জীবন হারাতে হবে। অথচ হারাতে মন চায় না। তাছাড়া, পুরোদস্তুর সংসারী হওয়া যাকে বলে, তা কোনদিনই কি হতে পারবে ও? ওর প্রকৃতির মধ্যেই জিনিসটা নেই। প্রতিবার চিন্তা-ভাবনার শেষে সিদ্ধান্ত নেয় ও, এই তো বেশ আছি, –একা, স্বাধীন, লাগামহীন বুনো ঘোড়া। তবু দুর্বল মুহূর্তগুলোয় ঘর বাঁধার সাধ জাগে বৈকি, সন্তানের পিতা হতে ইচ্ছে করে। ফুলের মত ফুটফুটে শিশু দেখলেই কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে।

সেই আদর পেয়েই রানাকে আপনজন ভেবে নিয়েছে টিউলিপ।

নিজের হাতেই খেলো টিউলিপ, তবে এক এক করে রানা তার সামনে এগিয়ে দিল খাবারগুলো, বুঝিয়ে-শুনিয়ে সবগুলো থেকে একটু একটু করে খাওয়াল। সবশেষে দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে বসল টিউলিপ, তার কোলের ওপর খেলনা ভাল্লুকটা দিয়ে এল রানা।

'লুকোচুরি খেলা?' জিজ্ঞেস করল টিউলিপ।

'দশ মিনিট পর।'

'কানামাছি?'

'বিকেলে।'

'তারমানে দুপুরে তুমি আমাকে ঘুম না পাড়িয়ে ছাড়বে না,

এই তো?' মুখ টিপে হাসল টিউলিপ। 'আচ্ছা, একসাথে ক'টা চাকরি করবে তুমি, শুনি? শেষ পর্যন্ত মিসেস কেনটারকির চাকরিটাও খেতে চাও?'

জবাবে শুধু মিষ্টি একটু হাসল রানা। টেবিল পরিষ্কার করার সময় বারবার টিউলিপের দিকে তাকাল ও। দুধের গ্লাস শেষ করে ভাল্লুকটা নিয়ে খেলায় মগ্ন সে।

এক হ―া হলো আমেরিকা থেকে তাকে বের করে এনেছে রানা। হফ ভ্যানডেরবার্গের কফিনের নিচে, ফলস কমপার্টমেন্টে ভরে। ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ক্রীটে এনেছে আজ দু'দিন। উপাদেয় খাবারদাবার, আর মুক্ত নির্মল বায়ু টিউলিপের চোখের নিচে জমে ওঠা কালি মুছে দিয়েছে, মুখে ফিরে এসেছে লালচে আভা।

টেবিল পরিষ্কার করে খবরের কাগজ নিয়ে বসল রানা। হেরাল্ড ট্রিবিউন-এ আন্তর্জাতিক খবরের অভাব নেই। শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়ে ব্রিটেনে হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির জন্যে কে দায়ী তাই নিয়ে জার্মানীতে বিতর্কের ঝড়। ওয়াশিংটনে, ক্যাপিটলের কাছে, একজন কংগ্রেস সদস্য খুন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের মেয়ে কিডন্যাপ সম্পর্কে কোন খবর নেই। ভেতরের পাতা খুলল রানা।

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোন।

প্রায় চমকে উঠে মুখ তুলল রানা।

'দেখো হয়তো মিসেস কেনটারকি ফোন করেছেন,' জানালার কাছ থেকে বলল টিউলিপ। 'তোমার চাকরির মেয়াদ বুঝি ফুরোল!'

মিষ্টি হেসে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা, বলল, 'ফোনে কথা বলার সময় তুমি কিন্তু আমাকে ডাকবে না, কেমন?'

খিল খিল করে হেসে উঠল টিউলিপ। 'ও, তুমি বুঝি ভেবেছ একা থাকতে আমার ভয় করবে!'

'জোয়ান অভ আর্ক!' বলে পাশের কামরায় চলে এল রানা, রিসিভার তুলল। 'হ্যালো?'

একটা মেয়ের গলা, 'অবশেষে ঝামেলা চুকল।' সাঙ্কেতিক মেসেজ, কর্নেল অবসনের তরফ থেকে এল।

'আমি বাঁচলাম,' পাল্টা সঙ্কেত দিল রানা। 'কেমন আছ?' কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার চিনতে পেরেছে ও।

'ব্যস্ত,' বলল জিনা। 'তোমার জন্যে উইলিয়াম অবসনের একটা মেসেজ আছে।'

'জানি। অবশেষে ঝামেলা চুকল। কখন?'

'আজ মাঝরাতে। নসোস-এ। গোলাপ কুঁড়ি বাড়ি ফিরছে।'

'আজ রাতে! কিন্তু অবসন আমাকে বলেছিলেন এখানে আমাকে দু'হপ্তা বা তারও বেশি থাকতে হবে। হঠাৎ তাড়াহুড়ো কেন, খারাপ কিছু ঘটেছে?' রানার মনে সন্দেহ।

'কি জানি, আমি তো কিছু জানি না।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, প্ল্যানটা কি বলো।'

'সহজ। টিউলিপকে আপনি অবসনের হাতে তুলে দেবেন, অবসন তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন।'

'তারপর কি ঘটবে?'

'তা তো জানি না। দেখা হলে অবসনকেই বরং জিজ্ঞেস করবেন।'

হ্যাঁ, ভাবল রানা, কর্নেল অবসনকে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করার আছে ওর। কিন্তু সে-সব পরে। 'নসোস-এ নাইট গার্ড আছে, তাই না?'

'মাত্র দু'জন—একজন গেটে, আরেকজন ভেতরে। অবসনের অনুরোধ, উনি পৌঁছুবার আগে ওদের একটা ব্যবস্থা করবেন আপনি।'

‘পালা বদল হয় না?’

‘হয়। রাত ন’টায় আসে গার্ড, দু’জন, সকাল পর্যন্ত থাকে। পালাবদল হয় সকাল সাতটার পর।’

প্ল্যানটা ঠিক পছন্দ হলো না রানার। জায়গাটা বড় বেশি নির্জন। তবে নসোসে মূল্যবান এমন কিছু নেই যে কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে। বেশিরভাগ প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ হেরাক্লিয়ন মিউজিয়ামে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ‘তুমিও কি থাকবে ওখানে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘সন্দেহ আছে।’

‘খারাপ কথা।’

‘এই ব্যাপারটা মিটে গেলে আবার আমাকে পাওয়া যাবে।’

অপরপ্রান্তে পরিচিত হাসিটা কল্পনায় দেখতে পেল রানা। ‘কথাটা মনে থাকবে,’ বলল ও।

‘গুড। তাহলে মাঝরাতে, কেমন?’ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

নড়ল না রানা, হাতে রিসিভার নিয়ে জানালা দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল জলপাই ঝোপের দিকে। জানে, স্বস্তিবোধ করা উচিত ওর। বিপদ প্রায় কেটে গেছে, কর্নেল অবসনের হাতে টিউলিপকে তুলে দিতে পারলে আর কোন দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু উদ্বেগ আর সন্দেহের অনুভূতি ছাড়ছে না ওকে, বরং আরও বেড়ে গেল। সঙ্কেতটা বড় তাড়াতাড়ি পৌঁছুল। মাত্র দু’দিন হলো ক্রীটে রয়েছে ওরা, অথচ থাকার কথা ছিল কমপক্ষে দু’হপ্তা। কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে?

কিচেনের দিকে পিছন ফিরল রানা।

‘কার ফোন জানতে পারি?’

ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খবরের কাগজটা তুলে নিল রানা। টিউলিপের বেডরুমে এসে ঢুকল। ‘মিসেস

কেনটারকির নয়। তবে তাকে তুমি খুব তাড়াতাড়ি দেখতে পাবে। তোমার বাবা-মাকেও।'

উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে উঠল কচি মুখটা। 'কখন?'

'কখন তা এখনই বলা যাচ্ছে না, তবে বেশি দেরি নেই।'

'বাবাকে বলব, তুমি আমার খুব যত্ন নিয়েছ,' বলে আবার আপনমনে খেলতে শুরু করল টিউলিপ।

খবরের কাগজের ভেতরের পাতায় মন দিল রানা। কিন্তু টিউলিপ চুপ করে থাকার মেয়ে নয়।

'কি মজা, কি মজা, জেফ কাকার ছবি ছাপা হয়েছে!'

কাগজটা ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল রানা। সত্যিই তাই, সি.আই.এ. চীফের ছবি ছাপা হয়েছে। তাঁর দু'পাশে দু'জন কূটনীতিককে দেখা যাচ্ছে। জেফ কাকা, হুহ্—ভাবল রানা। টিউলিপ হয়তো বিশ্বাসই করবে না তার এই জেফ কাকাকে হাতেনাতে ধরার জন্যেই...

টিউলিপের দিকে ফিরে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, তারপর আবার মন দিল পড়ায়।

'জেফ কাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন কবে?' জিজ্ঞেস করল টিউলিপ, খেলায় তার আর মন নেই।

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। পড়ার বারোটা বাজল। কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ারের উপর রাখল ও। টিউলিপের দিকে তাকাল। 'কে বলল তোমাকে জেফ রিকার্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন?'

'কে আবার, বাবা!'

রানার একটা ভুরু কপালে উঠে গেল।

'আমাকে নয়, আম্মিকে—আমি শুনে ফেলেছি।' মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে রোদ ঝলমলে বাগানের দিকে তাকাল টিউলিপ। 'আমাকে ফাঁকি দিতে চাও, তাই না? কই, সাঁতারের

কথা ভুলেও তো মুখে আনোনি। বলো কখন যাবে!'

'ঘুম থেকে ওঠার পর,' বলল রানা। কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে টিউলিপের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'জেফ কাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন। তোমার বাবা বলেছেন—কবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল টিউলিপ। তার মনে নেই, বা আগ্রহ নেই। হয়তো জানেই না। 'তোমার সবটুকু কিন্তু ভাল না—এখনই সাঁতার কাটতে গেলে কি হয় শুনি!'

'এই গরমে? পানি থেকে ওঠার সাথে সাথে আবার আগুন হয়ে যাবে গা। বিকেলে রোদ পড়ে আসবে, তখন, কেমন?' কাগজটা আবার তুলে নিল চেয়ার থেকে।

'আগামী ইলেকশনের পরে।'

মুখ তুলল রানা। 'কি?'

'বাবা তাই বলেছেন। আগামী ইলেকশনের পর জেফ কাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট হবেন।' হঠাৎ টিউলিপের চেহারায় কৌতূহল ফুটে উঠল। 'আগামী ইলেকশন কবে বলো তো?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা, কিন্তু আগ্রহে ছটফট করে উঠল মন। 'তোমার বাবা তাই বললেন? তোমার ঠিক মনে আছে?'

'বলল, শুনলাম, মনে থাকবে না কেন?'

'কখন?'

'এই তো বললাম।'

'না, কখন তিনি কথাটা বলেন?'

'জানি না।'

কাগজটা আবার চেয়ারে রাখল রানা, উঠে জানালার পাশে, টিউলিপের সামনে দাঁড়াল। 'লক্ষ্মী সোনা, মনে করার চেষ্টা করো। ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বুঝলে? চিন্তা করো, মনে পড়বে। ঠিক কখন তোমার বাবা-মা কথা বলছিলেন?'

কবে চোখের পাতা বন্ধ করল টিউলিপ। ঝাড়া এক মিনিট

পর খুলল আবার। 'আমি তখন একটা উপহারের প্যাকেট খুলছিলাম।'

'কি রকম উপহার?'

'একটা বই। বেড়াতে যাব, তাই...'

'মিশিগানে?'

মাথা ঝাঁকাল টিউলিপ।

'মিশিগানে বেড়াতে যাবার আগে–কোন্ দিন?'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল টিউলিপ। তারপর হঠাৎ তার মুখে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল হাসি। 'সেদিনই, যেদিন আমরা মিশিগানে বেড়াতে যাই।'

'তোমার ঠিক মনে আছে?' জরুরী ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভাল করে মনে করে দেখো–সেদিনই, না অন্য কোন দিন?'

চেয়ার থেকে নেমে ভাল্লুকটা মেঝেতে রাখল টিউলিপ, কোমরে হাত রেখে কড়া দৃষ্টিতে তাকাল। 'আমাকে কি ভাবো তুমি, মি. গ্রেসন? অনেক কথা ভুলে যাই বটে, কিন্তু যেটা মনে পড়ে সেটা ঠিকভাবেই মনে পড়ে। আমি নিজের হাতে বইটা সুটকেসে রাখি, সেদিনই প্লেনে চড়ি আমরা।'

যেদিন মিশিগানের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল টিউলিপ। নিউ ইয়র্কে রানার সাথে কর্নেল অবসনের দেখা হওয়ার পুরো এক হ⌐া পরে।

স্থির পাথর হয়ে বসে থাকল রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কচি মেয়েটার দিকে। বেচারি নিজের অজান্তেই এমন একটা তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে, সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেল রানার। প্রেসিডেন্ট রিচার্ড কনওয়ে যদি জানেন সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ড রাশিয়ার হয়ে কাজ করছেন, তাহলে কেন তিনি তাঁকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে চাইবেন?

তারমানেই দাঁড়ায়, কর্নেল অবসন ওকে মিথ্যে কথা বলেছে। প্রেসিডেন্ট টিউলিপকে কিডন্যাপ করার অনুমতি দেননি।

টেবিলের কাছে ফিরে এসে ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ল রানা। চমকে উঠে রানার দিকে তাকাল টিউলিপ। 'ফ্রেণ্ড, কি হলো তোমার? তুমি কি অসুস্থ?'

জোর করে হাসল রানা। 'আরে না। একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, তুমি খেলো।'

ব্যাপারটা তাহলে কি দাঁড়াল? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার কমাণ্ডার-ইন-চীফ-ও বটেন, তাঁর মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে রানা। ওকে বলা হয়েছিল, এই কাজে প্রেসিডেন্টের অনুমোদন আছে, এমনকি একটা অনুমতি-পত্রও দেয়া হয়েছিল ওকে।

জাল।

তারমানে টিউলিপ কিডন্যাপ হবার আগে এ-সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কিছু জানতেনই না। প্ল্যানটা তাহলে কর্নেল অবসনের একার, প্রেসিডেন্টের কোন ভূমিকা নেই।

মেয়েকে হারিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই পাগলপারা হয়ে আছেন। দুনিয়ার সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিমান পুরুষ তিনি, কিডন্যাপারকে কি শাস্তি দেয়ার কথা ভেবে রেখেছেন একমাত্র তিনিই জানেন।

নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। তারপর নিজের ওপর রাগ হলো। অবসনের মত একটা লোক তাকে এমন রাম বোকা বানিয়ে ছাড়ল!

কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হলো রানার। জীবনে বোধহয় এই প্রথম নিজের কাছে স্বীকার করল ও, ভয় করছে। খুলিতে কেউ রিভলভারের নল ঠেকালে যে-ধরনের ভয় জাগে মনে, এটা সেরকম নয়। জীবনের ভয় নয়, ভয় স্বাধীনতা হারাবার।

স্বাধীনতা মানেই তো জীবন। স্বাধীনতাহীন জীবনের চেয়ে মরে যাওয়া ভাল।

'মি. গ্রেসন?'

পাশে চলে এসেছে টিউলিপ, ওর শার্টের আস্তিন ধরে মৃদু টান দিল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, কেমন যেন দিশেহারা দৃষ্টি চোখে। 'কিছু বলবে?'

ঠোঁট ফুলে রয়েছে টিউলিপের, অভিমান হয়েছে। 'কি এমন সমস্যা যে তুমি আমার সাথে কথাও বলছ না... ।'

আদর করে কচি মেয়েটাকে কাছে টেনে নিল রানা। বুকে জাপটে ধরে চুমো খেল তার কপালে। 'দুঃখিত, মাণিক। সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এসো, এবার লুকোচুরি খেলি। যাও, আগে তুমি লুকাও।'

'বারে, তুমি আগে চোখ বন্ধ করো—ভেবেছ কোথায় লুকাব দেখে নেবে, না?'

চোখ বন্ধ করল রানা। এখন আর ভয় লাগছে না। রাগে কষকষ করছে শরীর। কর্নেল অবসনকে দেখে নেবে ও। ফল হাড়ে হাড়ে টের পাবে বাছাধন। অবসন ওকে ব্যবহার করেছে। ঠেলে দিয়েছে ভয়ঙ্কর এক বিপদের মুখে। তাকে রানা ক্ষমা করবে না।

একটু পর রাগও আর থাকল না। ভাবাবেগে অন্ধ হবার সময় নয় এটা। গোটা ব্যাপারটা সাবধানে বিশ্লেষণ করতে হবে, গভীর চিন্তা-ভাবনার দরকার, নিখুঁত একটা প্ল্যান চাই। প্রেসিডেন্ট কিছু জানেন না, অবসন মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু সে কি জেফ রিকার্ড সম্পর্কেও মিথ্যে কথা বলেছে? তা যদি হয়, তাহলে টিউলিপকে কিডন্যাপ করাল কেন?

একটা ব্যাপারে রানা নিশ্চিত, রাত কাবার হবার আগেই অবসনকে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করতে হবে। প্রতিটি ব্যাখ্যা

সন্তোষজনক হওয়া চাই। তা না হলে তার কপালে খারাবি আছে।

'এই যে আমি এখানে!' দরজার ওদিক থেকে টিউলিপের চিৎকার ভেসে এল। চোখ মেলল রানা। খোলা দরজার দিকে এগোল।

সাক্ষাতের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে। আজ মাঝরাতে, নসোসে। গোলাপ কুঁড়ি বাড়ি যাচ্ছে।

সত্যি কি যাচ্ছে?

পাঁচ

সামনে যানবাহনের বেয়াড়া ভিড়, কিন্তু ফাঁক গলে তীরবেগে ছুটল জেফ রিকার্ডের গাড়ি। জানেন ট্রাফিক পুলিস আটকাতে পারে, তবু স্পীড লিমিট মানছেন না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হোয়াইট হাউসে পৌঁছুতে হবে তাঁকে।

সরাসরি হোয়াইট হাউসে ঢুকল গাড়ি, গেট পেরোবার সময় হাত নাড়লেন গার্ডদের উদ্দেশে, ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামলেন ওয়েস্ট উইং এনট্রান্সের সামনে। ভেতরে ঢুকে একজন এইড-কে পাশ কাটালেন নিঃশব্দে, একটা দরজা খুলে স্টাফ অফিসে চলে এলেন।

'মি. ডিরেক্টর।' তাঁর পিছু পিছু এল এইড।

কিন্তু জেফ রিকার্ড তাকে দেখেও দেখলেন না। একটা আউটার অফিসে ঢুকলেন তিনি, কামরাটা ওভাল অফিসকে ঘিরে রেখেছে।

রিচার্ড কনওয়ের সেক্রেটারি, ঘুমহীন লাল চোখে রাজ্যের উদ্বেগ নিয়ে মুখ তুলল। অপর একজন লোক উত্তেজিতভাবে মেয়েটার ডেস্কের সামনে পায়চারি করছে। লোকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি, প্রেসিডেন্টের গেট-কীপার বলা হয় তাকে। ঘরে ঢুকতেই সে-ও ঝট্ করে জেফ রিকার্ডের দিকে তাকাল। 'আপনি ছিলেন কোথায়, স্যার? এক ঘণ্টা ধরে কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি আমরা... ।'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন জেফ রিকার্ড। 'প্রেসিডেন্টের সাথে এই মুহূর্তে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলে ভারী দরজাটার দিকে এগোলেন তিনি।

তাঁর পথ আগলে দাঁড়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি। 'এখন কিভাবে সম্ভব, স্যার? তিনি ই.ও.বি.-তে যাবার জন্যে রওনা হয়ে গেছেন। প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন।'

'প্রেস কনফারেন্স?' আকাশ থেকে পড়লেন জেফ রিকার্ড।

'আপনি জানেন না? প্রেসিডেন্ট রিজাইন করতে যাচ্ছেন!'

হতভ' জেফ রিকার্ড লোকটার দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। 'কিন্তু কেন?'

অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেক্রেটারি শুধু উদ্বিগ্ন নয়, উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ হয়ে রয়েছে। 'একমাত্র ঈশ্বর জানেন! কিভাবে যেন তাঁর ধারণা হয়েছে, টিউলিপ কিডন্যাপ হওয়ার জন্যে একমাত্র তিনিই দায়ী। এবং তিনি যদি পদত্যাগ করেন, টিউলিপকে আটকে রাখার আর কোন কারণ থাকবে না কিডন্যাপারদের।'

চোখ ছোট করে জেফ রিকার্ড বললেন, 'তাকে তোমার থামাতে হবে।'

হতাশায় মুষড়ে পড়ার ভঙ্গি করে হাত নাড়ল সেক্রেটারি। 'চেষ্টার ত্রুটি করিনি, স্যার। সবাই আমরা ফেল করেছি। তিনি কারও কথা শুনবেন না।'

'চেষ্টা করে দেখতে বলছি না, আমি বলছি তাকে থামাও!' স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গর্জে উঠলেন সি.আই.এ. চীফ। 'শোনো, ইউ বাস্টার্ড, প্রেসিডেন্ট মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছেন। এই মুহূর্তে এখানে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে তোমার। তাঁকে বলো, পামেলা কনওয়ে মারা গেছে। যা খুশি বলো, শুধু ফিরিয়ে আনা চাই তাঁকে। সাবধান, আসার পথে কারও সাথে তাঁকে কথা বলতে দিয়ো না।'

গেট-কীপার এক মুহূর্ত স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল, তারপর ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ডেস্কের পিছনে বসা মেয়েটার দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। চোখ লাল করে কোন লাভ হবে না। নিজেকে সামলাও, সারারাত ব্যস্ত থাকতে হবে। কোন রকম ইতস্তত না করে দরজা খুলে ওভাল অফিসে ঢুকলেন তিনি—একা।

নসোসে যাবার পথে, দু'পাশে সার সার গাছ। কিছু গাছ কেটে ফাঁকা একটা জায়গা বের করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে পাকা পার্কিং লট। এই মুহূর্তে দুটো গাড়ি রয়েছে ওখানে। লোহার চেইন দিয়ে তৈরি আধুনিক বেড়া ঘিরে আছে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। রাত প্রায় দশটা। দিনের আলো অনেক আগেই নিভে গেছে, সেই সাথে বিদায় নিয়েছে শেষ ট্যুরিস্ট লোকটাও।

রানা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখান থেকে ধ্বংসাবশেষ কিছুই দেখা যায় না। জায়গাটাকে ঘিরে আছে মাথা উঁচু সার সার গাছ, আর ঝোপ-ঝাড়। তবে পাহাড়ের মাথা থেকে ফ্লাডলাইটের আলো আসছে নিচে, গেট হাউসটা পরিষ্কার দেখা গেল। স্যুভেনিরের দোকানটা বন্ধ, বন্ধ টিকেট কাউন্টারও। কাউন্টারের পাশের কামরাটাই গার্ডরুম, ওখান থেকে গেট পাহারা দেয় গার্ড।

বাতাসের সাথে ভেসে এল কফির গন্ধ, আর রেডিওর গান।

গাছের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল রানা, কাঁকর ছড়ানো পথ এড়িয়ে নরম মাটিতে পা ফেলে এগোল ও। গেট হাউসের দিকে যাচ্ছে, পিছন থেকে। কাছাকাছি পৌঁচেছে, রেডিওর গান বন্ধ হয়ে গেল। অনুষ্ঠান ঘোষক গ্রীক ভাষায় সময় বলছে। তারপর শুরু হলো খবর।

মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষা খাওয়ার আওয়াজ শুনল রানা। কংক্রিটের মেঝেতে বুট জুতোর শব্দ হলো। খবর পাঠকের গলা মাঝপথে থেমে গেল, ডায়াল ঘোরাল কেউ। অন্য স্টেশন ধরা হলো, আবার গান শোনা গেল। ফিরে এসে আবার চেয়ারে বসল গার্ড।

গার্ড হাউসের দেয়াল ঘেঁষে এগোল রানা। বাঁক নিল। পরের দেয়ালের কিনারায় এসে উঁকি দিয়ে তাকাল সামনে। মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে গার্ডরুমের দরজা। চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকল ও। তারপর ঝুঁকে এক মুঠো কাঁকর তুলে নিল, ছুঁড়ে দিল বেড়া লক্ষ্য করে।

লোহার ওপর পাথর বৃষ্টি হলো, বেশ জোরালই হলো আওয়াজটা। শুনতে পেয়ে রেডিও বন্ধ করল গার্ড, কান পাতল। কিন্তু চেয়ার ছেড়ে নড়ল না।

আরও এক মুঠো কাঁকর তুলল রানা।

এবার নড়ে উঠল চেয়ার। ঘরের ভেতর থেকে পায়ের আওয়াজ এগিয়ে এল দরজার দিকে। দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, মুখ খুলে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। নড়ে উঠল একটা হাত, দেখে নিল রিভলভারটা বেল্টে ঠিক মত আছে কিনা।

দরজা খোলার শব্দ।

চৌকাঠ পেরিয়ে আলো-অন্ধকারে বেরিয়ে এল গার্ড।

লোকটাকে ঘাড় ফেরাবার কোন সুযোগই দিল না রানা। এক

হাতের কিনারা দিয়ে ওর ঘাড়ের পাশে প্রচণ্ড এক কোপ মারল, অপর হাত দিয়ে চেপে ধরল মুখ। তারপর দুই হাত দিয়ে অজ্ঞান দেহটাকে ধরে ফেলল মাটিতে পড়ার আগেই, নামিয়ে রাখল ধীরে ধীরে।

টেনে গার্ডরূমের ভেতরে আনা হলো লোকটাকে। পকেট থেকে প্লাস্টিক সিরিঞ্জ বের করল রানা। সারারাত ঘুমোবার জন্যে যথেষ্ট তরল ভ্যালিয়াম আছে সিরিঞ্জে।

চারদিকের দেয়ালগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা। ফিউজ বক্সটা দরজার পিছনে। এক ঝটকায় খুলল সেটা, ভেতরের ওয়্যারিং পরীক্ষা করল, যা খুঁজছে পেয়ে গেল। মাস্টার সুইচ ধরে টান দিল জোরে, মাথার ওপর বালবটা নিভে যেতে অন্ধকার হয়ে গেল গার্ডরূম, একই সাথে নিভে গেল বাইরে পাহাড়ের মাথার ওপর ফ্লাডলাইট।

দরজার পিছনে আরও একটু সরে দাঁড়াল রানা। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

পাঁচ মিনিটও পেরোল না, খোঁজ নিতে এল দ্বিতীয় গার্ড। বাইরের চাঁদের আলোকে ম্লান করে দিয়ে জ্বলে উঠল তার টর্চ। গেটের ওদিক থেকে ভেসে এল পায়ের আওয়াজ।

একটু পরই তার গলা শোনা গেল, 'রিকো?'

মেঝেতে পড়ে থাকা গার্ড একচুল নড়ল না।

'রিকো?' এবার আগের চেয়ে জোরে ডাকল।

গার্ডরূমে কোন শব্দ নেই।

টর্চের আলো কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে গার্ডরূমের দরজা থেকে সরে গেল, ভেতর থেকে গেটের তালা খুলছে দ্বিতীয় গার্ড। ঘড় ঘড় শব্দে খুলে গেল লোহার গেট, কাঁকর ছড়ানো পথে বুট জুতোর ভারী আওয়াজ এগিয়ে আসতে লাগল। গার্ডরূমের ভেতর আলো পড়ল টর্চের।

আলোর পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল গার্ড। 'রিকো!' হাঁটু ভাঁজ করে সঙ্গীর পাশে বসল সে। লাফ দিয়ে দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, হাতের কিনারা দিয়ে এ-লোকটার ঘাড়েও প্রচণ্ড এক রদ্দা মারল। সঙ্গীর পাশে ধরাশায়ী হলো লোকটা। পকেট থেকে আবার সিরিঞ্জটা বের করল রানা।

তারপর, সাবধানের মার নেই ভেবে, দু'জনের মুখেই টেপ লাগিয়ে দু'জোড়া হাত পিছমোড়া করে বাঁধল ও। সিধে হয়ে দাঁড়াল, পিছিয়ে গিয়ে কাজগুলো কেমন হয়েছে খুঁটিয়ে দেখল। হাত দু'জোড়া বাঁধার পরও বেশ খানিকটা রয়ে গেছে নাইলন কর্ড, সেটা দিয়ে পা দু'জোড়াও বাঁধল এবার।

গার্ডরূম থেকে বেরিয়ে গেট পেরোল ও, উঠে এল পাহাড়ে। কাইরাটোস নদীর ওপর এখানে এককালে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে ছিল মিনোস প্রাসাদ। প্রাচীন বা আধুনিক যে-কোন মানের বিচারে প্রাসাদটা ছিল বিশাল। বহুতল প্রশস্ত কাঠামোর বিস্তার ছিল পাঁচ একরেরও বেশি জায়গা জুড়ে, সে-যুগে একসাথে আশি হাজার লোকের জায়গা সংকুলান হত। প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্থাপত্য-বিস্ময়, সে-সময় এমনকি প্রাচীন গ্রীস সভ্যতারও সূচনা ঘটেনি।

আগাম কোন আভাস না দিয়ে মৃত্যু গ্রাস করে নসোসকে। নদীটা এখনও রয়ে গেছে বটে, কিন্তু প্রাসাদটা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে, পাথরের স্তূপ ছাড়া কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সম্ভবত ভয়ঙ্কর কোন ভূমিকম্প ঘটেছিল, তাতেই চার হাজার বছর আগে মিনোয়ান সভ্যতার পরিসমাপ্তি ঘটে যায়।

আছে শুধু ধ্বংসাবশেষ, আর্কিওলজিস্টের শাবলের আঘাত খাবার জন্যে। একতলার কাঠামো দেখে মনে হয়, পুরোটাই ছিল পাথরের তৈরি—মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠান, চারদিকে মোটা ভিত, ভিতের পাথর কেটে তৈরি শয়ে শয়ে ঘর। ভাঙা, ফাটল ধরা

পাথরের ফাঁকে ঝোপ গজিয়েছে।

কিছু কিছু দেয়াল, দশ বিশটা ঘরের অংশবিশেষ, মেরামত করা পাঁচিল, থামের ওপর পাথুরে বারান্দা, ভাঙাচোরা খিলান, ইত্যাদি দেখে কল্পনা করে নিতে হয় গোটা ব্যাপারটা কি রকম ছিল। কাত হয়ে পড়া কিছু পিলার, টাওয়ার, আর পাঁচিল খাড়া করা হয়েছে, নতুন করে রঙ চড়ানো হয়েছে গায়ে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই রয়েছে বুল'স হর্ন–কারুকাজ করা পাথুরে বুল'স হর্ন, একেকটা মানুষ সমান উঁচু, এককালে প্রাসাদ পাঁচিলের মাথায় শোভা পেত, মধ্য যুগের কোন দুর্গের চারধারে টাওয়ারের মত।

পাহাড়ের গোড়া থেকে ঝিঁঝি পোকা ডাকছে, কান পেতে শুনল রানা। নদীর কলকল ছলছলও এখান থেকে পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যায়। দূরে হেরাক্লিয়ন শহরের আলো জ্বলছে। তাছাড়া মানুষের তৈরি কোন আলো এই মুহূর্তে নেই এখানে। চার হাজার বছর আগে ধ্বংস হবার পর নসোস যেমন ছিল প্রায় তেমনি আছে। বড়, কালো একটা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ল চাঁদ। ধ্বংসাবশেষের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে শুরু করে রানা ভাবল, প্রতিটি সভ্যতাই আসলে অভিশ¬, এক সময় না এক সময় ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ সৃষ্টি করতে ভালবাসে, কিন্তু তার ধ্বংস-প্রবণতা আরও জোরাল। এই মানুষই তো পৃথিবীকে কয়েকশোবার ধ্বংস করার মত পারমাণবিক বোমা তৈরি করে রেখেছে। এবং তৈরি করাই হয়েছে ফাটাবার জন্যে। এত সাধের আধুনিক সভ্যতা, তাও বিলু¬ হয়ে যাবে, শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল বুক থেকে। চিন্তার ডালপালা গজাল। সভ্যতা বটে, আধুনিকও বটে, কিন্তু কাদের জন্যে? গোণা-গুণতি কয়েকটা উন্নত দেশের কথা বাদ দিলে, বাকি দুনিয়ার কয়েকশো কোটি লোক মানবেতর জীবনযাপন

করছে। তাদের কাছে এই সভ্যতার কানাকড়ি দাম নেই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, বুদ্ধিমান এবং বিবেকবান প্রাণী হয়েও মানুষ এখনও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে পারেনি। মানুষ না খেয়ে মরছে, অথচ তারই পাশাপাশি বিপুল ব্যয়ে চলেছে অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা।

এ-সব চিন্তা মাথায় ঢুকলে নিজেকে বড় অসহায়, দুর্বল, আর অক্ষম মনে হয় রানার। বরাবরের মত আজও মাথা থেকে সব বের করে দিয়ে শান্ত হবার চেষ্টা করল ও। দুনিয়াটাকে উদ্ধার করা ওর কর্ম নয়, কাজেই সময়মত চিন্তা-ভাবনার লাগাম টেনে ধরা দরকার, তা না হলে পাগল হতে হবে।

মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দিল চাঁদ। পাথুরে পথ ধরে এগোল রানা। এই পথ এক সময় তাজা রক্তে ভেসে গেছে। ভাঙাচোরা, এবড়োখেবড়ো ভিতের পাথর বেঢপ আকৃতির ছায়া ফেলেছে চারদিকে। কোথাও কোথাও গভীর খাদ দেখা গেল, এককালে ওগুলোয় তেল, মদ এই সব রাখা হত। কয়েকটার ভেতর উঁকি দিল রানা, অন্ধকার–তল পর্যন্ত দৃষ্টি চলে না।

ধ্বংসাবশেষের ওপর দিকে চোখ বুলাল রানা, প্রাসাদের যে ক'তলা আজও টিকে আছে। এত সব পাথরের নিচে, ওর পায়ের তলায় মাটির নিচে, আণ্ডারগ্রাউণ্ড প্যাসেজ আছে, জানে রানা। একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা সমস্যা, গোলকধাঁধার মত। গাইড বা ম্যাপ ছাড়া ওখানে নামতে সাহস পায় না কেউ। কড়া নিষেধও আছে।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রানা। রাত বাড়ছে, অনেক কাজ বাকি।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসে আছেন জেফ রিকার্ড, স্থির চোখে তাকিয়ে আছেন ফোনের দিকে। দুনিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ ফোন ওটা। আড়ি পাতা যন্ত্র আছে কিনা রোজ পরীক্ষা করা হয়, কোন

কোন সময় দিনে দু'বার। সেজন্যেই এখানে এসেছেন তিনি।

আসতে পেরেছেন সেজন্যে ঈশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। রিচার্ড কনওয়েকে কোনভাবেই পদত্যাগ করতে দেয়া যায় না।

দরজা খোলার আওয়াজ। সি.আই.এ. ডিরেক্টর মুখ তুললেন। অফিসে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁর চিবুক ঝুলে পড়েছে, চেহারা ম্লান। কিন্তু চোখ দুটো যেন দু'টুকরো অঙ্গার, জ্বলজ্বল করছে।

রাগ? ভাবলেন জেফ রিকার্ড। অসন্তোষ?

'কি বলার আছে তোমার, জেফ?' প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন করলেন, প্রাণপণ চেষ্টায় ভাবাবেগের লাগাম টেনে ধরায় কর্কশ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর।

চেয়ার ছেড়ে নড়লেন না জেফ রিকার্ড। কামরার অপরপ্রান্তে দাঁড়ানো পুরানো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, 'কিভাবে কি ঘটেছে সব আমি বুঝতে পেরেছি।' এক মুহূর্ত থামলেন তিনি, তারপর আবার বললেন, 'বিকট একটা সমস্যা, রিচার্ড!'

ওয়াশিংটন দূতাবাসে ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডর। চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। এইমাত্র হোয়াইট হাউস থেকে অদ্ভুত একটা অনুরোধ পেয়েছেন– শুধু অদ্ভুত নয়, ভীষণ জরুরী। ব্যাপারটা হজম করতে তিন সেকেণ্ড সময় লাগল তাঁর, তারপরই সামনের দিকে ঝুঁকে একটা বোতামে চাপ দিলেন। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইন্টারকম।

'ইয়েস, স্যার?'

'ফরেন অফিসের সথে নিরাপদ একটা লাইন চাই,' অ্যামব্যাসাডর বললেন। 'এই মুহূর্তে।'

পরবর্তী এক ঘণ্টার মধ্যে সেই একই অনুরোধ পেলেন আরও চারজন অ্যামব্যাসাডর। ইন্টারন্যাশনাল অপারেটররা সারারাত ধরে ব্যস্ত থাকল–সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে অসংখ্য বার্তা গেল আর এল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, এবং ইসরায়েলের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপর হয়ে উঠল অকস্মাৎ।

টানার মত সুতো যেখানে যা ছিল, সবগুলো টানলেন সি.আই.এ. চীফ জেফ রিকার্ড, শুধু একটা বাদে। ল্যাংলির সাথে তিনি কোন যোগাযোগ করলেন না। তাঁর নিজের এজেন্সি, সি.আই.এ-র সাহায্য তিনি নেবেন না।

□

রানার মতই কালো পোশাক পরা এক লোক মেরামত করা সাউথ গেট দিয়ে প্রাসাদের ভেতরে ঢুকল। এখান থেকেই শুরু হয় ট্যুর। ভেতরে ঢুকে এক মুহূর্ত থামল সে, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে সামনে এগোল, খোলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল বিশাল উঠানে। সিঁড়ির মাথায় আবার একবার থামল সে। চাঁদের আলো পড়ল তার মুখে।

কর্নেল উইলিয়াম অবসন।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল রানা। 'আপনি তো দেরি করার লোক নন,' বলল ও। বিশ মিনিট আগেই মাঝরাত পেরিয়ে গেছে।

'এর মানে কি, মি. রানা? এ-সব আপনি কি শুরু করেছেন?'

'শুরু করেছি!'

'করেননি? কি দরকার ছিল এই লুকোচুরি খেলার? এখন থেকে খুঁজছি আপনাকে? আপনার উচিত ছিল গেটের কাছে আমার সাথে দেখা করা।'

শ্রাগ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'ও, এই কথা,' সকৌতুকে বলল ও। 'কি করব বলুন, এই জায়গাটাই আমার পছন্দ হয়ে

গেল কিনা। তাছাড়া, আপনিও নিশ্চয় মানবেন, জায়গাটার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে।' সামনের প্রশস্ত দৃশ্যাবলীর ওপর চোখ বুলাল ও। ভাবল, ক্ষমতার আসন হিসেবে নসোস আদর্শ জায়গা, মিনোয়ান সম্রাটরা তা বুঝেছিলেন। প্রাচীন পাহাড়শ্রেণী চারদিক থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে। নিচে জলপাই ঝোপ, সাইপ্রেস গাছ, গভীর জঙ্গল—জমাট অন্ধকারের সবটুকু দূর করতে পারেনি ম্লান চাঁদের আলো। নদীর ছলছল আর ঝিঁঝি পোকার ডাক ছাড়া রাতটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। 'তাছাড়া, মি. অবসন,' বলল রানা, 'আপনার সাথে আমার কথা আছে।'

'কথা আছে? কথা বলার সময় কোথায়! মেয়েটা কই?'

'টিউলিপ এখানেই আছে,' বলল রানা।

'ধেত্তেরি, এখানে কোথায়?'

'ওই নিচে।' সিঁড়ি ঢেকে রাখা একটা সমতল ছাদের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। পাশাপাশি পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি প্রাসাদের নিচের স্তরে নেমে গেছে। কোন কোন সিঁড়ি তিন-চার তলা পর্যন্ত নেমেছে, নিচে গলি-উপগলির গোলক ধাঁধা। 'ঠিক কোথায়, সেটা আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমার বিশ্বাস চেষ্টা করলে পারবেন আপনি। দিন দশেকের মধ্যে পেয়ে গেলে আপনাকে আমি ভাগ্যবান বলব।' কথা শেষ করে অবসনের দিকে ফিরল ও।

পাল্টা দৃষ্টি হানল কর্নেল। 'তারমানে? সাম কাইণ্ড অভ জোক?'

মাথা নাড়ল রানা। ওর ঠোঁটে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'তা বলতে পারেন। কি জানেন, কেউ আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে আমিও তাকে নিয়ে ঠাট্টা করি—অভ্যেস।'

'কি বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।' রাগ সামলে রাখতে

হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে অবসন।

'তাহলে শুনুন। টিউলিপ আমার কাছে রয়েছে। আপনি তাকে চান। আপনি তাকে পেতেও পারেন। কিন্তু তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে আমার। মেয়াদ কমে গেল কেন? হঠাৎ এত তাড়াহুড়োর কারণ কি? আসলে কি ঘটছে?'

'মি. রানা!'

'নির্ভেজাল সত্য কাহিনী, মি. অবসন,' ভারী গলায় বলল রানা। 'নিন, শুরু করুন।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অবসন, চোখে আগুন ঝরছে। তারপর হঠাৎ নিজেকে সামলে নিল সে। কাঁধ ঝাঁকাল। বলল, 'বেশ। শুনবেনই যখন শুনুন। অল্প কথায় বলব। বসুন।'

রানা বসল না। হেলান দিল, পাথুরে বুল'স হর্নে কাঁধ ঠেকাল।

'আমি খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি, মি. রানা,' বলল অবসন। 'এবং বিপদের মধ্যে। মেয়াদ কমিয়ে আনার অনেক কারণের একটা হলো, ভুয়া সূত্র তৈরি করার জন্যে ডানিয়েলকে পাওয়া যাবে না।'

'সে মারা গেছে।'

ভুরু কুঁচকে তাকাল অবসন। 'আপনার জানার কথা নয়।'

'অনুমান।'

'হ্যাঁ, মারা গেছে।'

'আহা।'

'শুধু মারা যায়নি, খুন হয়েছে–জেফ রিকার্ডের এজেন্টরা খুন করেছে ডানিয়েলকে।'

'তাই?'

'জেফ রিকার্ড সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ নেই,' বলে চলল অবসন। 'যা যা করবে বলে আশা করেছিলাম, সব করেছে সে,

বরং আরও বেশি করেছে। নিজের স্বার্থে পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে লোকটা। তার জন্যে আমাদের তিনজন কী এজেন্ট মারা গেছে। শুধু মারা যাওয়াই যথেষ্ট খারাপ। প্রত্যেকে ওরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ট ছিল। কিন্তু বিপদ হলো প্রতিটি কেসে কেলেঙ্কারির বীজ আছে। কোন একটা যদি ফাঁস হয়ে যায়, সি.আই.এ. ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।' রাগের সাথে মাথা নাড়ল অবসন। 'সঠিক জানি না কিভাবে সে এই সর্বনাশ করতে পারল, তবে আন্দাজ করতে পারি। আমার ধারণা প্রথম থেকেই জেফ রিকার্ডের হয়ে কাজ করছিল ডানিয়েল।'

রানার চিবুক ঝুলে পড়ল, বিস্ময় গোপন করার কোন চেষ্টাই করল না ও। 'ডানিয়েল জেফ রিকার্ডের হয়ে কাজ করছিল? তারমানে জেফ রিকার্ড জানে...?'

'হ্যাঁ। জেফ রিকার্ড আপনার সম্পর্কে জানে। আপনি কোথায় আছেন, তাও। তাড়াহুড়োর কারণ এবার পরিষ্কার হয়েছে, মি. রানা?' প্রশ্নটা অবসন একটু ব্যঙ্গের সুরে করল।

বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও যেন কাটিয়ে উঠতে পারেনি রানা।

'আরও আছে,' বলল অবসন। 'যেমন আশা করেছিলাম, জেফ রিকার্ড সত্যি সত্যি রাশিয়ানদের কাছে গেছে। ঈশ্বর জানেন কত জন কে.জি.বি. এজেন্ট আপনার খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সে যাই হোক, আমরা আমাদের কেস প্রমাণ করেছি। আমি সন্তুষ্ট! এখন শুধু আমরা মেয়েটাকে হোয়াইট হাউসে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেই...'

কথাটা অবসন শেষ করতে পারল না। বিদ্যুৎবেগে আধপাক ঘুরে দাঁড়াল সে। সন্ত্রস্ত।

অকস্মাৎ নসোসের ফ্লাডলাইট জ্বলে উঠেছে।

চারদিকে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোর বন্যা বয়ে গেল। তারপরই শোনা গেল পিস্তলের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, বাতাসে শিস

কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। একটা বুল'স হর্নের ডগা বিস্ফোরিত হলো, ধুলোর মেঘ দেখা গেল বাতাসে। আওয়াজ শুনে বোঝা গেল ওদের পিছনের উঠানে কোথাও লাগল বুলেটটা।

কাছাকাছি ভিতের নিচু একটা কিনারায় আড়াল নিল অবসন। বেল্ট থেকে এক ঝটকায় রিভলভার বের করল রানা, বুল'স হর্নের নিরেট গোড়ায় গা ঢাকা দিল।

উঠানের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভেসে এল কথাগুলো। ভারী একটা কণ্ঠস্বর। ভাষাটা ইংরেজি হলেও, উচ্চারণ ভঙ্গি রুশ। 'স্রেফ সাবধান করে দেয়ার জন্যে গুলি করা হলো, পিকেরিং। তুমি জানো, লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না আমাদের। মাথার ওপর হাত তুলে লক্ষ্মী ছেলের মত বেরিয়ে এসো।'

হতবিহ্বল চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকাল অবসন, চোখে বিপন্ন বিস্ময়।

'আরও একটা ওয়ার্নিং শট, পিকেরিং।'

দ্বিতীয় বুলেটটা এল আরেক দিক থেকে, উঠানের উল্টো দিকের দেয়ালে লাগল।

পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল রানা, ক্রল করে ভিতের নিচু পাঁচিলের কাছে, অবসনের কাছাকাছি চলে এল। পকেট থেকে আগেই একটা পিস্তল বের করে নিয়েছে অবসন। ধীরে ধীরে খাড়া হলো সে, পাঁচিলের মাথার ওপর উঁকি দিল। গুলি হলো না, কারও গলাও শোনা গেল না। আবার নিচু হলো সে। বলল, 'কোথায় রয়েছে ওরা বুঝতে পারছি না।' ফিসফিস করে বলল, 'আসলে যে ব্যাপারটা কি তাও মাথায় ঢুকছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'অথচ আপনি বললেন রাশিয়ানরা নাকি আমাকে খুঁজছে।'

'এটা ঠাট্টা করার সময় নয়, মি. রানা। ওরা আমাদের কোণঠাসা করে ফেলেছে।' আবার সে উঁকি দিয়ে পাঁচিলের

ওদিকে তাকাল।

'আমাদেরকে?' শব্দ করে হেসে উঠল রানা। 'আমি যেন শুনলাম লোকটা শুধু আপনার নাম বলল–পিকেরিং!'

মুহূর্তের জন্যে নড়ল না অবসন। ধীরে ধীরে ঘুরল সে, রানার দিকে ফিরল। চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল, তাকিয়ে থাকল রানার হাতের দিকে। রিভলভারের নলটা তার কপালের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

যখন অ্যাকশনে ছিল, মাঠকর্মী থাকার সময়, হেনরি পিকেরিং কোডনেমটা ব্যবহার করত উইলিয়াম অবসন। ল্যাংলির কী এজেন্ট, যাদের সরাসরি পরিচালনা করত সে, তারা সবাই তাকে পিকেরিং হিসেবে চিনত। বিদেশী এজেন্টদের মধ্যে রানাই বোধহয় একমাত্র ব্যক্তি যে উইলিয়ামের কোডনেমটা জানে। নাম দুটো হলেও, লোক একজন। তবে রানা তাকে কখনও পিকেরিং হিসেবে সম্বোধন করেনি। অর্থাৎ রানা যে জানে তা অবসন জানে না।

মুখে কোন নির্দেশ দিতে হলো না, হাতের পিস্তল ফেলে দিল অবসন। তার চেহারায় শুধু ভয় নয়, ঘৃণাও দেখতে পেল রানা। চোখ দুটো জ্বলছে, তবে দৃষ্টিতে এখনও যেন খানিকটা অনিশ্চিত ভাব। ব্যাপারটা এখনও সে বুঝছে না।

'এখনও সময় আছে, পিকেরিং, বেরিয়ে এসো। তোমাকে আমরা খুন করতে চাই না। আমরা তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব বলে এসেছি।'

রানার মুখের ওপর স্থির হয়ে থাকল অবসনের দৃষ্টি। 'এসব কি ঘটছে?'

'ওদের কথা শুনলেই তো পারেন,' বলল রানা। 'ওরা আপনার বন্ধু, আমার নয়।'

'এ স্রেফ পাগলামি! আপনার কথা কিছুই আমি বুঝতে পারছি

না!’

‘আপনি, মি. ডেপুটি ডিরেক্টর!’ বলে হাসল রানা। ‘গন্ধটা ভালই ফেঁদেছিলেন, কিন্তু একটু খুঁত থেকে গিয়েছিল। জেফ রিকার্ড নন, বেঈমান আসলে আপনি নিজে। প্রথম থেকে। সি.আই.এ-তে আপনিই সেই ফাটল—কে.জি.বি-র চর। এর সাথে আমাকে জড়িয়ে কাজটা আপনি ভাল করেননি, মি. পিকেরিং।’

প্রতিবাদ করতে গেল অবসন, কিন্তু কোন লাভ নেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হলো। রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, ধীরে ধীরে চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল রাগ, ঘৃণা, আর বিমূঢ় ভাবটুকু। তার চিবুক ঝুলে পড়ল। পরমুহূর্তে গম্ভীর হলো সে। ঠাণ্ডা হয়ে এল দৃষ্টি। তিক্ত একটু হাসল সে। ‘ভুল হয়েছে, আপনাকে বিশ্বাস করা আমার উচিত হয়নি। আপনি অতি বড় ধড়িবাজ।’

‘নিন্দার জন্যে ধন্যবাদ দেয়ার নিয়ম নেই,’ বলল রানা। ‘উচিত হয়নি, কিন্তু তবু বিশ্বাস করেছেন।’

‘বাধ্য হয়েছিলাম। আর কেউ ছিল না যে কাজটা করতে পারত।’

শ্রাগ করল রানা। ‘সত্যি, ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছিলেন। সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর আসলে কে.জি.বি-র একজন এজেন্ট—মাই গড! কি রকম চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে আপনাকে, আন্দাজ করতে পারি। মস্কো থেকে তাগাদা, ওয়াশিংটনের মন যোগানো—সত্যি ভারি কঠিন কাজ। ব্যাপারটা কত দিন থেকে চালাচ্ছেন?’

‘বহু বছর।’

মাথা ঝাঁকাল রানা। অবাক হয়নি ও। পিকেরিং যোগ্য লোক, সব সময় তাই ছিল। অসম্ভব কঠিন একটা কাজ এত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে করতে পারায় মনে মনে লোকটার প্রশংসা করল ও।

কিন্তু প্রশংসার সাথে দায়িত্বের কোন সম্পর্ক নেই।

‘এই কাজটায় আপনি হাত দিলেন কেন?’ রানা কৌতূহলী হলো।

‘আপনি যা বললেন–মস্কোর তাগাদা। এখন যে পদে আছি, মস্কো তাতে সন্তুষ্ট নয়। বলল, আরও একটু ওপরে উঠতে হবে আমাকে। জেফ রিকার্ডের পদটা পেতে হবে।’

তাহলে এই। জেফ রিকার্ডের পদ। হঠাৎ করে খাপে খাপে মিলে গেল সব। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করো, স্বভাবতই মেয়ের সন্ধান পাওয়ার জন্যে বন্ধু সি.আই.এ. চীফের ওপর নির্ভর করবেন তিনি। তারপর জেফ রিকার্ডকে ভুয়া সূত্র পাইয়ে দিয়ে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাও। এরকম বার কয়েক করলেই প্রেসিডেন্ট উপলব্ধি করবেন তার বন্ধু নিতান্তই অযোগ্য, তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। মেয়ে কিডন্যাপ হলে এমন একটা ইস্যু তৈরি হবে, কেউ ব্যর্থ হলে তাকে তিনি ক্ষমা করবেন না।

‘আর আপনি হবেন উদ্ধারকর্তা,’ বলল রানা, ‘টিউলিপকে নিয়ে গিয়ে প্রেসিডেন্টের হাতে তুলে দেবেন। প্রেসিডেন্ট বরখাস্ত করবেন জেফ রিকার্ডকে, আপনি হবেন তাঁর প্রিয় বন্ধু এবং সি.আই.এ. চীফ।’

কথা না বলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অবসন। উত্তর দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

‘ব্রিলিয়্যান্ট,’ বলল রানা। ‘প্ল্যানটা সফল হতেও পারত।’

‘এখনও পারে।’

‘আমার তা মনে হয় না।’

‘কেন? আপনি আমাকে খুন করবেন?’

‘আরে না!’ বলে সশব্দে হেসে উঠল রানা।

মাঝে মধ্যে এমন এক একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, কে.জি.বি. আর সি.আই.এ. দুই ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে সমতা

বিধান করা দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় রানার। ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে যেটা ভাল মনে হয় সেটাই করতে হয় ওকে। চাপে পড়ে হোক বা অনুরোধে, আমেরিকার অনেক কাজ করে দিয়েছে রানা। আমেরিকানরা চেয়েছে রাশিয়ার ক্ষতি হোক, রানাও ভাব দেখিয়েছে তাতে তার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেছে, আমেরিকানদের ভুল বুঝিয়ে পার পেয়ে গেছে রানা, রাশিয়ানদের কোন ক্ষতি হতে দেয়নি। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে রাশিয়ানদের মেরিলিন চার্ট নিয়ে আসার কাজটা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল সি.আই.এ.। চার্টটা ঠিকই আনা হয়, কিন্তু আমেরিকানরা পায় নকল চার্ট, আসলটা ফেরত যায় মস্কোয়।

না, ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে বলে রাগের মাথায় অবসনকে রানা খুন করবে না। সমতা বিধানের একটা দায়িত্ব অনুভব করছে ও। এত বছর ধরে আমেরিকানদের গোপন তথ্য রাশিয়ায় পাচার করেছে অবসন, কি কি তথ্য পাচার করেছে তা আমেরিকানদের জানতে দেয়া উচিত। অর্থাৎ অবসনকে মরতে তো দেয়া যায়ই না, পালাতেও দেয়া যায় না। তাকে আমেরিকানদের হাতে তুলে দেবে রানা, তারা ওকে নিয়ে যা খুশি করে করুক। অবসন এটাকে যদি শাস্তি বলে মনে করে, সে শাস্তি তার পাওনা হয়েছে।

তবে, অবসন যদি কথা না শোনে, তাকে মেরে না ফেলে রানার কোন উপায় থাকবে না।

পাঁচিলের উল্টোদিকের গায়ে আরেকটা বুলেট লাগল। তারমানে রাশিয়ানদের ক্রস-ফায়ারের মাঝখানে পড়ে গেছে ওরা। শুধু সময়ের ব্যাপার, এক সময় না এক সময় গায়ে গুলি লাগবেই।

রানা নিজের জায়গায় স্থির থাকল।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে অবসন।

'বুঝেছি! আপনি মারবেন না, কিন্তু ওদের দিয়ে আমাকে মারাবেন!'

'উঁহুঁ। যেখানে আছেন থাকুন, নড়বেন না।' উঠে দাঁড়াতে গেল রানা।

'ওটা ছিল আমাদের শেষ ওয়ার্নিং, পিকেরিং,' কর্কশ শোনাল অচেনা কণ্ঠস্বর। 'হয় এখুনি বেরিয়ে এসো, তা না হলে সরাসরি গুলি... ।' রুশ কণ্ঠস্বর হঠাৎ করে নিস্তেজ হয়ে পড়ল, তারপর একেবারে থেমে গেল। নেমে এল জমাট নিস্তব্ধতা। তারপরই অন্ধকার নামল। মাথার ওপর নিভে গেল ফ্লাডলাইট।

লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা। সত্যি অবাক হয়েছে এবার, ভান করছে না। আঙুলগুলো রিভলভারের বাঁটে শক্ত হলো আরও, অবসনের দিকে তাক করে ধরে আছে। চাঁদের আলোয় সামনেটা যত দূর দেখা যায় তীক্ষ্ণ চোখ বুলাল।

অবসনের দৃষ্টিও ঘুরে গেল। সে যা দেখছে রানা তা দেখছে না। ধীরে ধীরে তার চেহারায় স্বস্তি ফুটে উঠল।

অবসনের দিকে তাকাল রানা, তারপর ঘাড় ফেরাতে শুরু করল। কিন্তু পিছন থেকে নির্দেশ এল, 'রিভলভার ফেলে দাও, রানা।'

একসেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল রানা। তারপর ধীরে ধীরে আলগা করল মুঠো, হাত থেকে খসে পড়ল রিভলভার।

বুল'স হর্নের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিনা, আলো আর ছায়া খেলা করছে তার মুখে। তার এক হাতে একটা অটোমেটিক। আরেক হাতে ছোট একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, টেপ ডেক, দুটো পিস্তল, আর অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক ডিভাইসের সাহায্যে আলো নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেছিল রানা। পিস্তল দুটো এমনভাবে সেট করেছিল ও, একটা গুলিও ওদের গায়ে লাগার কথা নয়।

জিনার হাতের দিকে তাকিয়ে মাস্টার সুইচটা দেখল অবসন। সব বুঝল সে। রানার দিকে ফিরে ফেটে পড়ল রাগে। 'টেপ! ইউ বাস্টার্ড! আগেই আমার আন্দাজ করা উচিত ছিল!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আমার যা জানার ছিল আমি তা জেনেছি।'

'তারমানে সবটুকুই আপনার অনুমান?'

হাসল রানা। 'কিন্তু এখন আমি জানি। আপনি কে.জি.বি. এজেন্ট। জিনাও তাই।'

মিষ্টি করে হাসল জিনা। 'তোমার আশ্চর্য লাগছে?'

'কেন আশ্চর্য হব,' নিরীহ ভঙ্গিতে বলল রানা। 'কোন কোন সাপ দু'মুখো হয় না?'

জিনার হাসি নিভে গেল, দেখে তৃপ্তি বোধ করল রানা। পিকেরিঙের দিকে ফিরল ও। নিজের পিস্তলটা কুড়িয়ে নিয়েছে সে। রানার বুকের দিকে তাক করে ধরে আছে। রানা তাকে খুন করত না, কিন্তু উল্টোটা সত্যি নয়। রানাকে খুন করা ছাড়া অবসনের কোন উপায় নেই।

'আর তো সময় নষ্ট করা চলে না,' বলল পিকেরিং। 'মেয়েটা কোথায়?'

পিস্তল থেকে চোখ তুলল রানা। আরেক পিস্তলের দিকে তাকাল। দু'জনেই ওরা সতর্ক, রানার প্রতিটি নড়াচড়া কড়া দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ও। তারপর ঝুলে পড়ল কাঁধ দুটো। নিষ্প্রভ হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। চেহারায় পরাজয় মেনে নেয়ার সমস্ত লক্ষণ ফুটে উঠল পরিষ্কার। 'বেশ। আসুন। নিয়ে যান মেয়েটাকে।'

ছয়

'পোলোনভকে আমি ব্ল্যাকমেইল করেছি,' জেফ রিকার্ড বললেন।

ঝট্ করে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট। 'কি করেছ?'

'ভুল শোনোনি। অনেক দিন আগে পোলোনভ একটা মেয়ের সাথে জড়িয়ে পড়ে। সেটা তেমন কিছু না, কিন্তু মেয়েটা ছিল লাল চীনের এজেন্ট।' সি.আই.এ. চীফ হাসলেন। 'প্রথমে পোলোনভ জানত না, যখন জানল সর্বনাশ যা হবার হয়ে গেছে–গোপন কিছু কাগজ-পত্র নিয়ে ভেগেছে মেয়েটা। মস্কোও ব্যাপারটা টের পায়নি, ডকুমেন্টগুলো হারিয়ে গেছে বলে তাদের বুঝ দেয় পোলোনভ। আমরা প্রথম থেকেই ব্যাপারটা জানতাম, দু'জনের অনেক ঘনিষ্ঠ ছবিও যোগাড় করা সম্ভব হয়েছিল। কে.জি.বি-র হাতে ওগুলো পড়লে পোলোনভকে মস্কোয় ডেকে পাঠানো হবে। কাজেই পিকেরিং এথেন্সে চলে যাবার পর সাহায্যের জন্যে পোলোনভের কাছে যাই আমি।'

'সাহায্যের জন্যে তুমি রাশিয়ানদের কাছে গেলে?' ক্লান্ত চোখের ওপর একটা হাত বুলালেন প্রেসিডেন্ট। 'ভাগ্যিস যাবার সময় আমাকে বলোনি!'

'তোমাকে তো বললামই কেন আমি তোমার কাছে আসতে পারিনি।'

'হ্যাঁ, জানি। তোমার ধারণা হয়েছিল আমিই হয়তো

টিউলিপকে কিডন্যাপ করিয়েছি।'

'বিশ্বাস আমি ভুলেও করিনি, কিন্তু তবু আমার নিশ্চিতভাবে জানার দরকার ছিল।'

'পরিস্থিতির কথা ভেবে এ নিয়ে তর্কে যাব না। থাক ওসব কথা। পোলোনভ প্রসঙ্গ শেষ করো।'

'আমি ওদের সেরা এজেন্টকে পিকেরিঙের পিছনে লাগাতে বলি,' শুরু করলেন জেফ রিকার্ড। 'বলি, পিকেরিং যা যা করবে, সব রিপোর্ট করতে হবে আমাকে। না বলার উপায় ছিল না তার। পিকেরিঙের পিছনে সারটভ নামে এক এজেন্টকে লাগায় সে। এবং সত্যি সত্যি পিকেরিঙের গতিবিধি রহস্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু সারটভকে দেখে ফেলে সে, খসিয়েও ফেলে। কিন্তু আমার ধারণা, এ অসম্ভব।'

'কেন?'

'কারণ সারটভ এত ভাল যে যার পিছু নেবে তার চোখে কক্ষনো ধরা পড়বে না, যদি না স্বেচ্ছায় ধরা পড়তে চায়, যদি না তার ওপর নির্দেশ থাকে ধরা পড়ার। কাজেই, পিকেরিঙের চোখে সারটভ কেন ধরা পড়ল তার ব্যাখ্যা একটাই: পোলোনভ, কে.জি.বি-র পদস্থ অফিসার, চায়নি পিকেরিংকে অনুসরণ করা হোক।'

ভাগ্যের প্রহসন উপলব্ধি করে তিক্ত একটু হাসলেন জেফ রিকার্ড। সি.আই.এ-তে পিকেরিঙের নিজস্ব লোক আছে এই ভয়ে তিনি কে.জি.বি-র সাহায্য নিতে যান, জানা ছিল না কে.জি.বি-রই লোক পিকেরিং।

'কেন? জিজ্ঞেস করলাম নিজেকে,' বলে চললেন তিনি। 'বলতে গেলে হঠাৎ করেই সব খাপে খাপে মিলে গেল। কে চাইতে পারে অ্যারোর মৃত্যু? রাশিয়ানরা। শুধুমাত্র রাশিয়ানরা। এ-ব্যাপারে আমাদের চিন্তা-ভাবনা প্রথম থেকেই সঠিক ছিল।

কিন্তু রাশিয়ানরা অ্যারোর পেট থেকে সমস্ত কথা আদায় না করে তাকে মারবে না। যদি না তাদের আগে থেকেই সব জানা থাকে, সি.আই.এ-র ভেতর নিজেদের এজেন্টের মাধ্যমে।'

'পিকেরিং।'

'হ্যাঁ, হেনরি পিকেরিং। সবচেয়ে জঘন্য জাতের বেঈমান। ঈশ্বর, তাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম।'

আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'তোমার ভুল হতে পারে?'

'পারে। কিন্তু হয়েছে বলে মনে হয় না।'

'কিন্তু কেন সে টিউলিপকে কিডন্যাপ করবে? না হয় ধরে নিলাম রাশিয়ানদের হয়ে কাজ করছে সে, রাশিয়ানরা চাইছেটা কি? চাওয়া তো দূরের কথা, কি চাইবে তার আভাস পর্যন্ত ওরা আমাকে দিচ্ছে না। হোয়াট ইজ দ্য মোটিভ?'

'আমার তিনজন কী এজেন্টকে সরানো, অবভিয়াসলি।'

'কিন্তু তুমি নিজেই বলেছ, টিউলিপকে কিডন্যাপ না করেও ওদেরকে তারা সরাতে পারত।'

'ডাইভারসন,' জেফ রিকার্ড পকেট থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। সিগারেট তিনি খান না বললেই চলে, শুধু যখন ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে থাকেন তখন ধরান, কিন্তু দু'একটার বেশি টান দেন না। 'এসপিওনাজ জগতের সাধারণ নিয়ম হলো চোখের বদলে চোখ। তারা যদি আমাদের কোন এজেন্টকে খুন করে, দেরি না করে উপকারটা আমরাও ফিরিয়ে দিই। কিংবা উল্টোটা ঘটে, আমরা ওদের একজনকে সরালে ওরা আমাদের একজনকে সরায়। তাই, নতুন নতুন এজেন্টকে চাকরি দেয়ার ঝামেলা এড়াবার জন্যে দু'পক্ষের মধ্যে অলিখিত একটা চুক্তি আছে—একান্ত বাধ্য না হলে কেউ কোন পক্ষের লোককে মারি না।' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'টিউলিপকে কিডন্যাপ করার

উদ্দেশ্য, আমরা যেন ভাবি খুন-খারাবিগুলো অন্য কোন শত্রু করছে। প্রথমে মারল অ্যারোকে। তারপর এগম্যানকে। তারপর মেরিলিনকে। আরও অনেক এজেন্টকে মারতে চাইবে ওরা, তালিকাটা নিশ্চয়ই ছোট নয়। কিন্তু চায় না আমরা পাল্টা প্রতিশোধ নিই। সেজন্যেই টিউলিপকে কিডন্যাপ করা দরকার মনে করেছে।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। 'মাঝে মধ্যে চিন্তা হয় আমার, ওদের চেয়ে কোন দিক থেকে আমরা ভাল কিনা।'

'আমরা লড়ি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে,' স্বতস্ফূর্ত দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে জবাব দিলেন জেফ রিকার্ড।

'এবং ঈশ্বর আমাদের পক্ষে।' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল প্রেসিডেন্টের ঠোঁটে। টুং-টাং শব্দে একটা বেল বেজে উঠল তাঁর ডেস্কে। ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে একমুহূর্ত শুনলেন, তারপর নামিয়ে রাখলেন। 'ফ্রেঞ্চরা রাজি হয়েছে,' বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। 'গুড। ফ্রেঞ্চ, ব্রিটিশ, ওয়েস্ট জার্মানস, অ্যাণ্ড গ্রীকস। শুধু ইসরায়েলীদের জবাব পেতে বাকি থাকল।'

'ওরা বেনিয়ার জাত, ঠিকই সহযোগিতা করবে,' প্রেসিডেন্ট বললেন। 'জানে সহযোগিতা না করলে আমার সরকার একটা সেন্টও সাহায্য দেবে না—অন্তত যতক্ষণ মানিব্যাগ আমার জিম্মায় আছে।'

আপনমনে হাসল জেফ রিকার্ড। এ লোক তাঁর চেনা, একে তিনি পছন্দ করেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'পদত্যাগ করোনি বলে এখনও কি দুঃখিত?'

'কি জানি। এখনও করতে পারি।' বন্ধু জেফ রিকার্ড প্রতিবাদ করতে যাচ্ছেন দেখে একটা হাত তুলে তাঁকে বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'হেনরি পিকেরিংকে সন্দেহ করি বলে কিছুই কিন্তু

বদলায়নি, জেফ,' বললেন তিনি। 'এ থেকে শুধু জানা গেছে কেন আমরা প্রতারিত হয়েছি, আর কেন কি ঘটেছে তার খানিকটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। তাছাড়া, পরিস্থিতি সেই আগের মতই আছে।'

জেফ রিকার্ড গম্ভীর হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

'ভেবে দেখো না, আমি যদি প্রেসিডেন্ট না হতাম, টিউলিপ কি কিডন্যাপ হত? হত না। পামেলাকেও এত ভুগতে হত না। টিউলিপ, পামেলা, দু'জনেই ওরা আমার উচ্চাকা–ক্ষার খেসারত দিচ্ছে, তাই নয় কি? মূল্য আমাকেও কম দিতে হচ্ছে না। সব কিছুর পিছনেই তো একটা কারণ–আমি প্রেসিডেন্ট।' মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকালেন তিনি। 'উত্তরটা আমার জানা নেই, জেফ। হয়তো এ-ব্যাপারটা মিটে গেলে পদত্যাগ করাই আমার উচিত হবে।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। বন্ধুর বক্তব্য তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন। বললেন, 'মিটে যাবে, এইটুকু গ্যারান্টি তোমাকে আমি দিতে পারি। খুব তাড়াতাড়িই মিটবে। এখন আর আমাদের হাত থেকে পালাবার কোন উপায় নেই পিকেরিঙের। দুনিয়ার অর্ধেক ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট খুঁজছে তাকে, তাই না?'

ওপরতলার চাতালে রয়ে গেল পিকেরিং। সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা, কাছাকাছি পিছনে থাকল জিনা। জিনার হাতে একটা টর্চ জ্বলে উঠল, নিচের গাঢ় অন্ধকারে আলো ফেলল সে।

পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি আবার নতুন করে তৈরি করা হয়েছে। কাঠের বিমগুলো অসম্ভব মোটা, পিলারগুলো মিনোয়ান ধাঁচের, সবগুলো সিঁড়ি আর নিচের স্তরের কামরাগুলোকে ঠেক দিয়ে রেখেছে।

রঙচঙে পিলারের ফাঁক গলে ফালি ফালি চাঁদের আলো নিচেও কিছু কিছু জায়গায় নেমে এসেছে। চারদিকে ম্লান আলো, ঘন আর হালকা ছায়া, এবং গাঢ় অন্ধকার। একটা ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুল ওরা। ঘুরল। নামতে শুরু করল আরেক প্রস্থ সিঁড়ির ধাপ বেয়ে।

এর চেয়ে আরও দূরের বিপদ আঁচ করতে শিখেছে রানা। জিনার পিস্তল ওর পিঠে ঠেকে নেই বটে, কিন্তু ঠেকে থাকলে যতটুকু চাপ অনুভব করত প্রায় ততটুকুই অনুভব করছে ও। জানে, কোন রকম চালাকির চেষ্টা করতে দেখলে সরাসরি হৃৎপিণ্ডে গুলি করবে ডাইনীটা। সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এল ও।

প্রাসাদের পশ্চিম শাখায় রয়েছে ওরা, এদিকের অ্যাপার্টমেন্টগুলোয় রাজ-পরিবারের লোকজন বসবাস করত। ট্যুরিস্টদের জন্যে বিরাট এক আকর্ষণ জায়গাটা। মসৃণ দেয়াল জুড়ে সার সার বাংলা 4 সংখ্যার আকৃতি নিয়ে জ্যামিতিক নকশা। ডান দিকে একটা দরজার ওদিকে লম্বা করিডর। এই করিডরের কোথাও বাস করতেন স্বয়ং সম্রাট। দরজা পেরিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, দেয়ালের নকশাগুলো ব্যাখ্যা করার জন্যে থামল না, বা মূর্তিগুলোর পরিচয় সম্পর্কে লেকচার দিল না। লম্বা করিডর ধরে খানিকদূর এগোল ও।

'কোথায়?' পিছন থেকে কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল জিনা।

'কে?' নিরীহ ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'আমরা? নাকি টিউলিপ?'

'মানলাম তোমার খুব সাহস,' ব্যঙ্গের সুরে বলল জিনা। 'জীবনের ওপর কোন মায়া নেই। আমি জানতে চাইছি, আর কতদূর? কোথায় রেখেছ টিউলিপকে?'

'আর বেশি দূরে নয়, কাছেই,' বলল রানা। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'সাবধান!' চাপা স্বরে গর্জে উঠল জিনা।

রানার পিঠের পেশী কিলবিল করে উঠল, ওগুলোর যেন নিজস্ব প্রাণ আছে। 'বোকার মত গুলি কোরো না, তাহলে টিউলিপকে খুঁজে পাবে না। শোনো, তোমার সাথে আমার কথা আছে, জিনা। আমি ঘুরছি... ।'

'না!'

ঘুরতে শুরু করেও স্থির হয়ে গেল রানা। জিনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ভয় পাইয়ে দিয়েছে ওকে। ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না, মেয়েটা নির্ঘাত গুলি করে বসবে। 'শোনো, জিনা, আমার একটা প্রস্তাব আছে,' আবেদনের সুরে বলল রানা। 'এসো, আমরা একটা চুক্তি করি।'

'পাগল!'

'আহা, আগে শোনোই না!' ব্যস্ত সুরে বলল রানা। 'কাজটার জন্যে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার ফি পেয়েছি আমি। টাকাটা ব্যাংকে আছে। আমার প্রস্তাবে রাজি হও, অর্ধেক, মানে এক বিলিয়ন ডলার দেব তোমাকে।'

খিল খিল করে হেসে উঠল জিনা। রানার অসহায় অবস্থা বুঝতে পেরে ভয় কেটে গেছে তার, কৌতুক বোধ করছে। সুর করে বলল, 'এ-ক-বি-লি-য়-ন ড-লা-র! ওমা, সে তো অনেক টাকা!'

'তোমার কোন ভয় নেই, জিনা,' এখনও রানা জিনার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। 'পিকেরিং কিছু বোঝার আগেই তাকে আমরা কাবু করে ফেলব। কে.জি.বি-কেও ফাঁকি দেয়া সম্ভব, প্লাস্টিক সার্জারির সাহায্যে চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে নেবে তুমি। সব ব্যবস্থা আমিই করে দেব। ইচ্ছে করলে রানা এজেন্সিতে কাজ করতে পারবে তুমি, কিংবা কাজ না করে সারাটা জীবন ভোগবিলাসে কাটিয়ে দিতে পারবে। সবচেয়ে খুশি হব তুমি যদি আমার সাথে থাকো, মানে তুমি আর আমি বাকি জীবন যদি

একসাথে কাটিয়ে দিই, মন্দ কি? ভেবে দেখো··· ।'

'একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করল জিনা, 'গবেট!'

'কেন, জিনা, কি হারাবে তুমি? ভেবে দেখেছ, কি বিপদে পড়তে যাচ্ছ? একদিন না একদিন পিকেরিং ধরা পড়বেই, তখন কি অবস্থা হবে তোমার? আমি তোমাকে জীবনের নিরাপত্তা দেব, প্রাচুর্য দেব,···'

'আর একটাও কথা নয়,' কঠিন সুরে বলল জিনা। 'এগোও!'

'কিন্তু কারণটা বলবে না?' ব্যাকুল সুরে জিজ্ঞেস করল রানা। 'এরচেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি আশা করো তুমি?'

'তোমার কোন প্রস্তাবই আমাকে টলাতে পারবে না, মাসুদ রানা,' শান্ত গলায় বলল জিনা। 'কারণ হেনরি পিকেরিংকে আমি ভালবাসি।'

চুপ করে থাকল রানা। তারপর বলল, 'ও। তারমানে সি.আই.এ. চীফের বউ হবার স্বপ্ন দেখছ তুমি।'

'কেন, যদি প্রেসিডেন্টের বউ হই তোমার আপত্তি আছে?' শব্দ করে হাসল জিনা, লম্বা করিডরে প্রতিধ্বনি উঠল। 'কে বলতে পারে, হেনরি পিকেরিং একদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে না?'

কাঁধ ঝুলে পড়ল রানার, হতাশ ভঙ্গি করে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। 'চেষ্টা করে দেখলাম আর কি। আমার কপাল মন্দ।'

'টিউলিপকে পিকেরিঙের হাতে তুলে দিই, তারপর অনুরোধ করে দেখব ওকে, তোমার ওপর যদি একটু দয়া করে,' বলল জিনা। 'যদিও মনে হয় না যে তোমাকে ও বাঁচিয়ে রাখতে চাইবে।' ছোট্ট একটু শব্দ করে রানার পিছনে হাসল সে, রানার কানে অশ্লীল আর কদর্য শোনাল। 'তাতে কিন্তু হিতে বিপরীতও ঘটতে পারে, রানা। ওকে তো তুমি চেনো না, আমি অনুরোধ

করলে ও হয়তো আমাকেই হুকুম করবে তোমার কনুই আর হাঁটুতে গুলি করার জন্যে। তারপর শেষ গুলিটা, বুকে বা মাথায়, ও নিজেই হয়তো করবে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার, কিন্তু জিনা তা দেখতে পেল না।

'চলো,' আদেশ করল জিনা।

এক মুহূর্ত পর পা বাড়াল রানা। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে আরেক লম্বা করিডরে চলে এল ওরা, এদিকে দু'পাশের ঘরগুলোর আকৃতি অন্য রকম।

এখানে চাঁদের আলো নেই, টর্চের পিছনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। টর্চের আলোয় মাঝে মধ্যে সামনের দেয়াল দেখতে পেল রানা, মসৃণ বা রঙ করা নয়, কর্কশ পাথর। এবার ঘরগুলোর ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে, কখনও বাঁ দিকে কখনও ডান দিকে। প্রাসাদের কারখানা ছিল এগুলো, হাতের কাজ শেষ হয়নি এমন সময় ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যায়। অসমাপ্ত কাজের পাশে পড়ে আছে যন্ত্রপাতি, আতঙ্কিত কারিগররা পালিয়েছে। ঘর থেকে সরু প্যাসেজে, আবার ঘরে, গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল রানা। ট্যুরিস্টদের যে-সব জায়গায় ঘুরতে দেয়া হয়, সে-সব জায়গা থেকে দূরে সরে এসেছে ও। এদিকের বাতাসে ভাপসা একটা গন্ধ। নিকষ কালো অন্ধকার।

আবার কথা বলে উঠল জিনা, যতটা না উদ্বিগ্ন তারচেয়ে বেশি রাগান্বিত। 'কি করছ শুনি? নিশ্চয়ই আরও শর্টকাট কোন পথ আছে।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'থাকলেও আমি চিনি না।'

দাঁড়িয়ে পড়ল জিনা, তারপর আবার অনুসরণ করল রানাকে।

ঘুরে প্রাসাদের উল্টো দিকে চলে এসেছে ওরা। এদিকে শুধু

স্টোরেজ রুম, প্রত্যেকটা সরু আর লম্বা। বেশ কয়েকটা খালি নয়। মেঝেতে, একপাশে উঁচু হয়ে আছে মাটির পাহাড়। আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখা গেল, আর্কিওলজিস্টরা রেখে গেছে। হঠাৎ করে নয়, ধীরে ধীরে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল রানা। জিনা আগের মত নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ওর পিছনে থাকল। একটা দরজা পেরিয়ে বাঁদিকে ঘুরল ওরা, সামনে আরেকটা দরজা।

'দেখো, সাবধানে,' সতর্ক করে দিল রানা। 'মাথার ওপর দিকে ভারা বাঁধার খুঁটি আর তক্তা আছে।'

চৌকাঠের তলার কাঠ পেরোবার সময় মাথা নিচু করল রানা।

টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলল জিনা। লোহা, আর কাঠের খুঁটি, পিলার, ক্রস-বিম, ইত্যাদির সামনে রয়েছে রানা, তার ওপর একটা চোখ রাখল সে। রানা বলল আর সে বিশ্বাস করল, তেমন মেয়ে জিনা নয়। টর্চের আলো ওপর দিকে ফেলে নিজের চোখে দেখে নিল—হ্যাঁ, সত্যি, মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে ভারা বাঁধার অসংখ্য খুঁটি আর তক্তা।

মাথার ওপর, নাগালের মধ্যে একটা বাঁশ দেখতে পেয়ে সেটা ধরল রানা, নিচে ওর পা আরেকটার ওপর পড়ল। চৌকাঠ পেরিয়ে এল জিনা।

শূন্যে।

খোলা একটা পাথুরে শ্যাফট। খাড়া টানেল, ওপরের দিকে উঠে সিলিঙে ঠেকেছে, চল্লিশ ফিট নিচে শেষ হয়েছে গিয়ে মেঝেতে। এখানে প্রাকৃতিক কোন আলো নেই, তবে শ্যাফটটা আগে এক বার এসে দেখে গিয়েছিল রানা। নিচের মেঝেতে বড় আকারের একটা সাদা পাথর আছে, তা থেকেই আন্দাজ করা যায় শ্যাফটটা কি কাজে ব্যবহার করা হত। পাতাল সমাধি, বলি দেয়া মানবসন্তানের শেষ আশ্রয়।

দরজার কিনারা থেকে খসে পড়ছে বুঝতে পেরে আহত পশুর

মত একটা দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল জিনার গলা থেকে। পিস্তল আর টর্চ উড়ে গেল হাত থেকে, পাখির ডানার মত বাতাসে ঝটপট ঝটপট করতে লাগল হাত দুটো, তাল সামলে নিয়ে চৌকাঠের ওপর থাকার ব্যর্থ চেষ্টা। টর্চের আলো সুনিপুণ বৃত্ত রচনার ভঙ্গিতে ঘুরল। নিচে কোথাও থেকে উঠে আসা একটা খুঁটির মাথায়, আড়াআড়িভাবে বাঁধা মোটা বাঁশের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। মুহূর্তের জন্যে এক হলো দু'জনের দৃষ্টি। জিনার চোখে নগ্ন আতঙ্ক, চরম উপলব্ধি, করুণ আবেদন, আর নিÒল আশা।

তাল হারিয়ে ফেলল জিনা, হাত দুটো রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। টর্চটা আধপাক ঘুরে নিচের দিকে মুখ করল, এবার পিস্তলটার মতই দ্রুত নামতে শুরু করল নিচের দিকে, আলোটা পড়ল নিচের মেঝেতে।

আলো-আঁধারের মধ্যে আর্তনাদ শোনা গেল। রানার সামনে দিয়ে একটা ছায়া সরে যেতে বাতাসের মৃদু স্পর্শ পেল ও। নিচে আলো, মাঝখানে পতনশীল জিনা, ওপরে রানা। প্রথম একটা ধাতব শব্দ উঠে এল, সাদা পাথরে পিস্তলটা পড়ল। দ্বিতীয় শব্দের সাথে নেমে এল গভীর অন্ধকার। তারপর পাথরে আছাড় খেলো মাংস আর হাড়। চিৎকার থেমে গেল। নেমে এল নিস্তব্ধতা।

তাজা রক্ত গড়াল প্রাচীন পাথরে।

লাফ দিয়ে চৌকাঠ পেরোল রানা। দরজার পাশে একটা গর্তে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার, আর একটা টর্চ বের করল। কাজে লাগবে জানত, তাই এখানে এগুলো লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল।

ফিরতি পথে ছুটল ও।

ধ্বংসাবশেষের গভীর তলদেশ থেকে ভেসে এল ভোঁতা আর্তনাদ, সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল হেনরি পিকেরিঙের। অটল দাঁড়িয়ে

থাকল সে, বোঝার চেষ্টা করল ঠিক কোন্ দিক থেকে এল আওয়াজটা। তারপর সিঁড়ির মাথার দিকে এগোল সে, যে-পথে রানাকে নিয়ে নেমে গেছে জিনা। পিস্তলটা শক্ত করে ধরল।

মেয়েলি গলা? নাকি পুরুষের? বলা অসম্ভব। এ-ও হয়তো রানার কোন চালাকি, খোলা জায়গা থেকে সরিয়ে নিচের অন্ধকারে নামাতে চায় তাকে।

জিনার কথা ভাবল সে। মেয়েটার প্রতি তার আস্থা আছে। যেমন সুন্দরী, তেমনি নিষ্ঠুর। শত্রু নিধনে ওর জুড়ি মেলা ভার। মিষ্টি হাসবে, লোভ দেখাবে, একটু একটু করে কাছে টানবে, প্রয়োজনে বিছানায় উঠবে—আহ্, বিছানায় জিনা তুলনাহীন—উজাড় করে দেবে নিজেকে, তারপর ঠোঁটে মিষ্টি হাসি ধরে রেখে ছুরি চালাবে গলায়। ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট, রানা তাকে বিপদে ফেলতে পারবে না।

তারপর সে রানার কথা ভাবল। রানা আর টিউলিপ, তার প্ল্যানের গুরুত্বপূর্ণ দুটো উপাদান। টিউলিপ হলো ট্রাম্প কার্ড, ওটা দেখিয়েই খেলা জিতে নেবে সে। ওকে উদ্ধার করে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবে হোয়াইট হাউসে। রানার বুদ্ধি আছে, ঠিক ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা। জেফ রিকার্ড যেখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ, হেনরি পিকেরিং সেখানে সম্পূর্ণ সফল। এই সাফল্যের বদলে সামান্য একটা দাবি—ডিরেক্টরের পদ। প্রেসিডেন্ট আপত্তি করবেন না। কেন আপত্তি করবেন? সে কি তার মেয়েকে উদ্ধার করে আনেনি? জেফ রিকার্ড কি অযোগ্যতার প্রমাণ দেয়নি?

কিন্তু টিউলিপ ছাড়া পিকেরিঙের প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যাবে। জেফ রিকার্ডের মতই অযোগ্য বলা হবে তাকে। ওয়াশিংটনে সে নিন্দার পাত্র হবে। আরও ভয়ঙ্কর, মস্কোয় সে নিন্দার পাত্র হবে।

হ্যাঁ, টিউলিপকে তার দরকার। রানাকেও। সে-ই একমাত্র বাইরের লোক যে গোটা ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে। তাই

ওকে ফিরতে দেয়া হবে না। এখানে, এই নসোসেই থেকে যেতে হবে ওকে। খুব বড় একটা হুমকি, কাজেই বাঁচিয়ে রাখা চলে না।

ব্যাপারটা নিয়ে জিনার সাথে একটু তর্ক হয়েছে পিকেরিঙের। জিনার একটা শখ ছিল, পিকেরিং সেটা অগ্রাহ্য করেছে। রানাকে নিয়ে বিছানায় শুয়েছে জিনা, তাই তার ইচ্ছে নিজের হাতে খুন করবে ওকে। মেয়েটার মধ্যে এই অদ্ভুত একটা বিকৃতি রয়েছে। কোন শত্রুকে তৃপ্তি দিলে নিজের হাতে তার প্রাণপ্রদীপও নিভিয়ে দিতে চায়। শুধু যে বিকৃত রুচি তা নয়, জিনার উদ্ভট কিছু আশাও আছে। তার ধারণা, সি.আই.এ. ডিরেক্টর হবার পর পিকেরিং তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে।

আপনমনে হাসল পিকেরিং। ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে জিনাকে মস্কোয় ফেরত পাঠাবে সে। কাছেপিঠে এরকম একটা পিশাচিনী থাকলে মন লাগিয়ে কাজ করা যায় নাকি?

উঠান পেরিয়ে এল পিকেরিং, লাফ দিয়ে একটা নিচু পাঁচিলে চড়ল। এখান থেকে ধ্বংসাবশেষের এক মাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। প্রাসাদের আণ্ডারগ্রাউণ্ড অংশ থেকে ওপরে উঠে আসার অনেকগুলো পথ রয়েছে। বেশিরভাগই মেঝের গায়ে সাধারণ গর্ত। এই গর্ত থেকে একা রানার পক্ষে উঠে আসা কোন সমস্যা নয়, কিন্তু হাতে বা কাঁধে টিউলিপ থাকলে তা পারবে না। কাজেই ওকে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে। সিঁড়ি রয়েছে দু'দিকে—এক দিকে পাশাপাশি পাঁচটা, আরেক দিকে একটা। যেদিক থেকেই উঠে আসুক রানা, টিউলিপকে নিয়ে বা একা, সাথে জিনা থাক বা না থাক, এখান থেকে তাকে ঠিকই দেখতে পাবে পিকেরিং। সে-ই প্রথম দেখতে পাবে।

উঠতে রানাকে হবেই। বেরুবার আর কোন পথ নেই।

পায়ের আওয়াজ! উঠানের উল্টো দিক থেকে! কেন?

কে যেন পা টিপে টিপে হাঁটছে। দক্ষিণ গেটের ধাপ বেয়ে

উঠে আসছে কেউ। এক ঘণ্টা আগে ওই পথ দিয়ে পিকেরিং নিজেই এসেছে।

রানা? অসম্ভব। তবে কি রানার আরেকটা কৌশল?

কুঁজো হলো পিকেরিং, পিস্তল ধরা হাতটা তুলল, শক্ত করে অপর হাতে ধরল কব্জি।

হুইসেলের আওয়াজ। পাখির ডাক। বেরুল মানুষের গলা থেকে। নিশ্চয়ই একটা সঙ্কেত। পাহাড়ের গোড়ায় একটা সুইচ অন করা হলো। মাথার ওপর চোখ ধাঁধানো ফ্লাডলাইটের আলো জ্বলে উঠল। নর্থ পোর্চ, আর পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ির ওপর ব্যগ্র দৃষ্টি বুলাল পিকেরিং। ঝট্ করে তাকাল উঠানের দক্ষিণ সিঁড়ির দিকে। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর।

'পুলিস! অস্ত্র ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসুন। সব কটা বেরুবার পথ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।' ইংরেজি নয়, ভাষাটা এবার গ্রীক। মুখের সামনে বুলহর্ন নিয়ে কথা বলছে কেউ।

চিৎকার করে পিকেরিং বলল, 'তোমার চালাকি আমি ধরে ফেলেছি, রানা!'

এবার গ্রীক নয়, ইংরেজিতে নির্দেশ এল, 'হেরাক্লিয়ন পুলিস! মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসুন!'

চুপ করে থাকল পিকেরিং। অপেক্ষা করছে।

'আপনাকে সাবধান করছি, মিস্টার, গুলি করার জন্যে তৈরি হয়ে আছি আমরা।'

হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় একটা ছায়ামূর্তিকে দেখা গেল—প্রথমে শুধু মাথা, তারপর কাঁধ। সাদা শার্ট, সোনালি আর কালো চাপরাস, কালো ক্যাপ। দু'হাতে ধরা একটা পুলিস রিভলভার।

পিকেরিং আর অপেক্ষা করল না। গুলি করল।

লোকটার শরীর শূন্যে উঠে গেল, এক সেকেণ্ড ঝুলে থাকল সেখানে, তারপর পিছন দিকে হেলে পড়ল। সিঁড়ির নিচে, চোখের

আড়ালে হারিয়ে গেল দেহটা। হঠাৎ করে আরও দুটো ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল কুঁজো হয়ে, এদেরও সাদা শার্ট, আর কালো ক্যাপ। ছুটছে তারা, এক আড়াল থেকে আরেক আড়ালে সরে যাচ্ছে। তিনজন, চারজন।

পুরো এক ব্যাটালিয়ন পুলিস! সত্যি সত্যি পুলিস!

লাফ দিল পিকেরিং, নিচু পাঁচিল থেকে নেমে ছুটল। পাথরের গায়ে আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে পড়ল উঁচু আরেক পাঁচিলের মাথায়। এক, দুই, তিন, একের পর এক ছুটে এল বুলেট। পাঁচিলের মাথা থেকে আরেক দিকে লাফ দিয়ে পড়ল সে। বাঁ দিকে ঘুরে ছুটল, খোলা পেভমেন্টের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়াচ্ছে, সামনের নিচু পাঁচিলগুলো টপকে যাচ্ছে লাফ দিয়ে। অনেকগুলো আড়াল পেলেও মাত্র দু'এক জায়গায় থামল সে। পুলিস খুন ছেলেখেলা ব্যাপার নয়, তাও আবার বিদেশের মাটিতে। ধরা পড়লে নির্ঘাত... পিকেরিঙের চিন্তা থমকে গেল। ধরা পড়লে মানে? ওরা কি তাকে ধরার চেষ্টা করছে?

জান নিয়ে পালাতে হবে। রুখে দাঁড়াবার সময় নয়। টিউলিপ কনওয়েের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রানার কথা, কিন্তু ওদের ভাবনা পরে ভাবলেও চলবে। সে শুধু এখন আশা করতে পারে, চিৎকারটা জিনার ছিল না, ছিল রানার। আশা করতে পারে, জিনার হাতে চলে এসেছে টিউলিপ। এবং জিনাও পালাবার একটা পথ পেয়ে যাবে।

বেড়া লক্ষ্য করে ঝেড়ে দৌড় দিল পিকেরিং। বেড়াটা টপকাবার সময় পিছনে পায়ের আওয়াজ শুনল সে। আহত পশুর মত দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে। অনেক দিন হলো ফিল্ড থেকে অবসর নিয়েছে, প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ করা অভ্যেস নেই। হাপরের মত হাঁপাতে লাগল সে। বেড়ার মাথা থেকে আলুর বস্তার মত ঘাসের ওপর ধপাস করে পড়ল। মনে

হলো, অনেকগুলো হাড় ভাঙল। কিন্তু পরমুহূর্তে ক্যাঙারুর মত লাফ দিল সে, তীর বেগে ছুটল আবার।

সামনে মাঠ। পিছনে চিৎকার। চারদিকের মাটি বুলেট লেগে ছিটকাল। ভাগ্যই বলতে হবে, একটাও তার গায়ে লাগল না। রেঞ্জের বাইরে চলে এল সে। তারপর অকস্মাৎ তার সামনে যমদূতের মত উদয় হলো একজন পুলিস, পিস্তল ধরা হাত তুলে লক্ষ্য স্থির করল।

গুলি করল পিকেরিং। বন করে ঘুরে গেল লোকটা, দড়াম করে আছাড় খেল মাটিতে। লাফ দিয়ে তাকে টপকাল সে, ফাঁকা চাতালের দিকে ছুটল। রেখে যাওয়া গাড়িটা দেখতে পেল সে।

গাড়িতে উঠে ইগনিশনে চাবি ঢোকাল পিকেরিং, হাত দুটো কাঁপছে বলে মা-বাপ তুলে গাল দিল নিজেকে। চাতাল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল গাড়ি, নতুন এক ঝাঁক বুলেট একটা টায়ারকেও ছুঁতে পারল না। স্পীড তুলল পিকেরিং, হেরাক্লিয়নের দিকে ছুটল গাড়ি।

মাইলখানেক এগিয়ে হঠাৎ মোড় ঘুরল পিকেরিং, কাঁচা পথ ধরে একটা ফার্মহাউসের দিকে এগোল। গোলাঘরের প্রকাণ্ড দরজা হা হা করছে। ভেতরে ঢুকে এঞ্জিন বন্ধ করল, তালা দিল গোলাঘরের দরজায়। জানালার নিচে এসে মাথা তুলল, উঁকি দিল বাইরে। রাস্তা দিয়ে সগর্জনে ছুটে গেল একজোড়া পুলিস কার।

মেঝেতে বসে পড়ল পিকেরিং, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, উত্তেজনা আর ক্লান্তিতে কাঁপছে সারা শরীর। ভাগ্যিস এই আস্তানার ব্যবস্থা আগেই করে রেখে গেছে জিনা! পিকেরিং তার কাপড়চোপড়, কাগজ-পত্র, অফিশিয়াল পাসপোর্ট, সব রেখে গিয়েছিল এখানে। আরেকটা গাড়ি আছে লুকানো। টেলিফোনও আছে।

বিপদ আপাতত কেটে গেছে, কিন্তু নতুন সমস্যা হয়ে দাঁড়াল বাজপড়া মাথা। প্রচণ্ড ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল সে। ব্যথা

শুধু মাথাতেই নয়, গোটা পিঠও ধপ ধপ করছে। আর বুকের ভেতর ফুসফুসকে যেন খিঁচুনি রোগে ধরেছে। একটু বিশ্রাম নিই, ভাবল সে, তারপর ফোন করব। সতর্ক অবস্থায় নিজের লোকজন অপেক্ষা করছে, ডাক পেলেই ছুটে আসবে তারা।

টিউলিপ যদি জিনার হাতে থাকে, তাকে নিয়ে এখানে চলে আসবে সে। কিন্তু মিথ্যে স্বপ্ন না দেখে বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়া দরকার এখন। চিৎকারটা রানার ছিল না, ছিল জিনার, বিশ্বাস করতে না চাইলেও মনের ভেতরটা সে-কথাই গাইছে।

নসোস থেকে বেরিয়ে আসবে রানা। যেভাবে হোক, পালাবার একটা রাস্তা ঠিকই বের করে নেবে সে। তবে চার বছরের একটা বাচ্চাকে নিয়ে পায়ে হেঁটে কত দূর যেতে পারবে?

হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই গাড়ি আছে রানার। সম্ভবত তারই মত একটায় চড়ে এসেছে, আরেকটা কাছেপিঠে লুকানো আছে। আর গাড়ি মানেই রাস্তা।

এই রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা, নসোস থেকে বেরুবার এটাই একমাত্র পথ।

দু'হাতে মাথার চুল খামচে ব্যথাটা কমাবার চেষ্টা করল পিকেরিং। টলতে টলতে দাঁড়াল সে। দরজার দিকে পা বাড়াতেই একটা আওয়াজ ঢুকল কানে। ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে পিস্তলটা কোমর থেকে বের করে আনল।

'গুলি কোরো না!'

গোলাঘরের পিছন থেকে এগিয়ে আসছে এক লোক। চওড়া অবয়ব। চওড়া কাঁধ। স্লাভিক চেহারা।

'সারটভ?'

রুশ এজেন্ট ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

'এখানে তুমি কি করছ?' অবাক হয়ে জানতে চাইল পিকেরিং।

'দেখতেই পাচ্ছ—তোমার সাথে যোগাযোগ।'

'এমন বোকামি করে কেউ! আরেকটু হলে তো তোমাকে আমি মেরেই ফেলতাম!'

'ঝুঁকি না নিয়ে উপায় ছিল? অন্ধকারে বুঝব কি করে লোকটা তুমি?'

'যোগাযোগ করার দরকার পড়ল কেন তাই বলো। আমার হাতে সময় নেই।'

'সময় তোমাকে তৈরি করে নিতে হবে, কমরেড।'

রাগে ছোট হয়ে গেল পিকেরিঙের চোখ। 'কি?'

জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকছে, সরে এসে সেই আলোয় দাঁড়াল সারটভ। 'বড় একটা সমস্যায় পড়েছি আমরা,' বলল সে। 'জেফ রিকার্ড তোমার পরিচয় জেনে ফেলেছে।'

কোথায় অদৃশ্য হলো রাগ, স্তম্ভিত বিস্ময়ে সারটভের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল পিকেরিং। মাথার ভেতর কিলবিল করে উঠল তীক্ষ্ণ মুখ কতগুলো প্রশ্ন। কিভাবে? কেন? কি ঘটেছে?

শুধু অভিজ্ঞ নয়, প্র্যাকটিক্যাল লোক, নিজেকে পিকেরিং দিশেহারা হতে দিল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ধাক্কাটা সামলে নিল সে। প্রশ্নগুলোর উত্তর তাকে পেতেই হবে, উত্তরগুলোর ওপর নির্ভর করছে জীবন-মৃত্যু, কিন্তু এই মুহূর্তে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া সাজে না। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'তারমানে প্ল্যান বদলাতে হবে। টিউলিপকে নিয়ে নসোসে রয়েছে রানা। ওকে পেতে হবে আমার।'

পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ির গোড়ায় প্রায় পৌঁছে গেছে রানা, এই সময় দপ্ করে জ্বলে উঠল আলো, সেই সাথে বুলহর্নে নির্দেশ শোনা গেল। পুলিস! পুলিস এল কোথা থেকে?

একটা ভাঁড়ার ঘরে গা ঢাকা দিল রানা, ওখানে আকাশের

দিকে মুখ খোলা সরু একটা শ্যাফট রয়েছে। লাফ দিল ও, কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল, তারপর পাথুরে দেয়ালে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে মাথা উঁচু করে উঁকি দিল বাইরে।

গ্রাউণ্ড লেভেল থেকে গোটা দৃশ্য পরিষ্কার দেখা গেল। বেড়া টপকে পালাচ্ছে পিকেরিং, তার পিছু পিছু ছুটছে পুলিস। তবে আরও পুলিস রয়েছে, ধ্বংসাবশেষের ভেতর তল্লাশি চালাচ্ছে তারা।

মেঝেতে নামল রানা। এক সেকেণ্ড চিন্তা করল। তারপর করিডর ধরে আবার ফিরে এল রাজকীয় অ্যাপার্টমেন্টগুলোর কাছে। পিছন থেকে ভেসে এল ফিসফাস গলার আওয়াজ, বুট জুতোর ভোঁতা শব্দ। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে পুলিস। গ্রীক ভাষায় নির্দেশ শোনা গেল। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে সশস্ত্র লোকজন। ছুটন্ত পায়ের শব্দ, এদিকেই আসছে।

কামরাটা ভাল করে দেখল রানা। খালি কামরা, নগ্ন চারটে দেয়াল, আর মসৃণ সিলিং—লুকোবার কোন জায়গা নেই। নিঃশব্দ পায়ে, দ্রুত, উল্টোদিকের দরজা দিয়ে ইংরেজি বর্ণমালার এল আকৃতির একটা করিডরে বেরিয়ে এল ও। করিডর থেকে আরেক চেম্বারে ঢুকল। আগেরটার চেয়ে ছোট এটা, দেয়ালে নীল ডলফিন আঁকা। নসোস-রাণী সখীদের নিয়ে খেলা করতেন এখানে। গোলকধাঁধার শেষ মাথা বলা চলে।

দরজা আরও একটা আছে, সরাসরি রাণীর কামরায় ঢোকা যায়। তারপর ছোট একটা প্যাসেজ, প্যাসেজের মাথায় খুদে একটা ঘর—রাণীর বাথরূম।

বাথরূমে কোন আলোর ব্যবস্থা রাখা হয়নি, ট্যুরিস্টরা শুধু দিনের বেলা আসতে পারে এখানে। মেঝেতে লম্বা হয়ে রয়েছে বড়সড় পাথরের তৈরি বাথটাব, আজও অটুট। ভাবতে আশ্চর্য লাগে শেষবার রাণী এখানে গোসল করার পর চার হাজার বছর

পেরিয়ে গেছে।

বাথটাবের পিছনে হাঁটু মুড়ে বসল রানা, তারপর শুয়ে পড়ল।

ওর পথ ধরেই এগিয়ে আসছে পায়ের আওয়াজ। এল আকৃতির করিডরে পৌঁছে গেছে পুলিস। অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ, তার মধ্যে একজোড়া রাণীর কামরায় ঢুকল। আরও কয়েক জোড়া পিছু পিছু ঢুকল। হঠাৎ সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আবার এগোল। ছোট্ট প্যাসেজে বেরিয়ে এল লোকগুলো। বাথরূমের দিকে আসছে।

রানার বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করে উঠল।

সবাই আসছে না, মাত্র দু'জন।

নিথর পড়ে থাকল রানা, এক চুল নড়ল না। অক্সিজেনের অভাবে বুক ফেটে যাবার অবস্থা হওয়ায় মাত্র দু'একবার শ্বাস নিল ও।

বাথরূমের দরজায় পৌঁছুল একজোড়া পা। পিছু পিছু এল আরেক জোড়া। দাঁড়িয়ে আছে ওরা। মাকড়সার জাল না কি যেন নাকে ঢুকল, হাঁচি আসতে চাইল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকগুলো, চলেও যাচ্ছে না, ভেতরেও ঢুকছে না। নাক আর মুখে হাত চাপা দিয়ে হাঁচি আটকে রাখল রানা।

টর্চের আলো পড়ল বাথরূমে।

আলোটা খুদে কামরার কোণগুলোয় ঘোরাঘুরি করল কিছুক্ষণ, বার কয়েক বাথটাবের কিনারা ছুঁয়ে গেল। রানা যেন জড়পদার্থ, নড়ছে না। হঠাৎ টর্চ ধরা হাতটা দ্রুত ঘুরে গেল, আলোটা মেঝের নির্দিষ্ট একটা জায়গার ওপর স্থির হলো।

'ওটা কি?'

এক মুহূর্ত কোন শব্দ হলো না। তারপর একজোড়া পা চৌকাঠ পেরিয়ে কামরার ভেতর ঢুকল। বাথটাবের পাশে মেঝের ওপর হাত বুলাল সে। সিধে হলো। 'পয়সা। আমেরিকান।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল।

দোরগোড়া থেকে অপর লোকটা হেসে উঠল। 'তাতে কি? রোজ হাজার হাজার ট্যুরিস্ট আসছে, পকেট থেকে পড়ে যেতে পারে না? দেখাই তো যাচ্ছে কেউ নেই এখানে—চলো!'

টর্চের আলো নিভে গেল। আবার শব্দ হলো পায়ের। দূরে সরে যাচ্ছে।

বসল রানা। উঁকি দিয়ে বাথটাবের ভেতর তাকাল। তলাটা গাঢ় রঙের চাদরে ঢাকা। চাদরটা সরাল ও।

নির্ভাবনায় আগের মতই ঘুমাচ্ছে টিউলিপ কনওয়ে। সারা মুখে নিবিড় প্রশান্তি, বন্ধ পাতার ভেতর চোখের মণি একটুও নড়ছে না। আবার তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে রানা, বেচারি জানে না তার ওপর দিয়ে কি ধরনের বিপদ যাচ্ছে। এক অর্থে ঘুমের ওষুধই টিউলিপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। আরেকটা বাস্তব সত্য হলো, টিউলিপই এখন রানার একমাত্র রক্ষাকবচ। টিউলিপকে হারালে ওর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

টিউলিপের পালস পরীক্ষা করল রানা, স্বাভাবিক। তার গায়ে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে দিল, তারপর চাদর সহ তুলে নিল কাঁধে। বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল ও।

সেই খালি কামরাটার বাইরে, করিডরে, পাহারায় রয়েছে একজন পুলিস। পিছিয়ে এসে কামরাটা আরেকবার খুঁটিয়ে দেখল রানা। নিরেট দেয়াল। সিলিঙে কোথাও ফাঁক-ফোকর নেই। ওর পিছনে রাণীর কামরা, গোলকধাঁধার শেষ প্রান্ত। বেরুবার শুধু এই একটাই রাস্তা।

টিউলিপকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। দরজা দিয়ে উঁকি দিল আবার করিডরে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। হাত দুটো দু'পাশে ঝুলে আছে ঢিলেঢালা ভাবে। কিন্তু চোখ সতর্ক। ডান হাতে রিভলভার।

কোমরের বেল্ট থেকে নিজের রিভলভারটা বের করল রানা। দরজার আরেক পাশে সরে গিয়ে রিভলভারটা তুলল। সাবধানে লক্ষ্যস্থির করল ও। তারপর ট্রিগার টেনে দিল।

আঁতকে উঠে লাফ দিল পুলিস। রিভলভার ধরা হাতটা তুলল, গুলি করার জন্যে তৈরি। লোকটা ঘুরেছে, তবে যেদিক থেকে গুলি হলো সেদিকে নয়, টার্গেটের দিকে। মাথার ওপরকার বালবটা বিস্ফোরিত হলো, গুঁড়ো কাঁচ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরল সে, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে রিভলভার, প্রায় অন্ধকার লম্বা করিডরের শেষ মাথার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। ডান দিকের খোলা দরজাগুলো দিয়ে রাজকীয় অ্যাপার্টমেন্টে যাওয়া যায়, বাঁ দিকের দরজাগুলো দিয়ে যাওয়া যায় কারিগরদের কারখানায়। দু'পাশের যে-কোন দরজা দিয়ে ভাঁড়ার ঘর, পোশাক ঘর, খেলা ঘর, বসার ঘর, ইত্যাদি আরও অনেক ঘরে যাওয়া যায়। করিডরের শেষ মাথায় ছোট, খিলান আকৃতির একটা ভারী দরজা, তালা ঝুলছে।

গুলিটা কোত্থেকে হয়েছে বোঝার উপায় নেই।

এক পা সামনে বাড়ল লোকটা। কোথাও কোন শব্দ নেই। সাহস একটু বাড়ল। আরও এক পা এগোল সে।

প্রতিটি পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছে রানা। দরজার সামনে থেকে সরে এসেছে ও, পাশের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দরদর করে ঘামছে। রিভলভারটা বেল্টে গুঁজে রেখেছে ও। হাত দুটো পিছনের দেয়ালে সেঁটে রয়েছে। সাবধানে, ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে লোকটা। দরজার দিকে।

দাঁড়াল।

দরজার ভেতর অন্ধকার। উঁকি দিল সে। স্যাঁৎ করে দোরগোড়ায় বেরিয়ে এল রানা, রিভলভার ধরা হাতে ঝাপটা মারল জোরে, খটাস করে মেঝেতে পড়ল সেটা। অপর হাত দিয়ে

লোকটাকে কাছে টানল রানা, নিজের বুকের ওপর। চিৎকার করার জন্যে মুখ খুলেছিল লোকটা, কিন্তু রানার কাঁধ তার মুখচাপা দিল। ধস্তাধস্তি শুরু করল লোকটা, তার পিঠ থেকে হাত সরিয়ে চোয়ালের পাশে গলায় জোরে মারল রানা। নার্ভ সেন্টারে তীব্র ব্যথা নিয়ে জ্ঞান হারাল পুলিস। ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু।

ধীরে ধীরে তাকে মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। টিউলিপকে কাঁধে নিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ও। ছোট খিলান আকৃতির দরজার দিকে দ্রুত পা চালাল। পুরানো তালাটা আগেই সরিয়ে ফেলেছে রানা, যেটা ঝুলছে সেটা ওর নিজের তালা। পকেট থেকে চাবি বের করে খুলল সেটা। টিউলিপের পিঠে একটা হাত রেখে ভেতরে ঢুকল।

এটা ঠিক কোন কামরা নয়। এক কালে ছিল বটে, এক সময় আবার হয়তো বা হবে। স্রেফ একটা গুহা, মাটি আর খোঁড়াখুঁড়ির যন্ত্রপাতিতে ঠাসা—কোদাল, শাবল, চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি, মাটির তৈরি তৈজস-পত্রের ভাঙা অংশ, ইত্যাদি। বিধ্বস্ত একটা চেম্বার, ট্যুরিস্টদের দেখানোর জন্যে নয়। ম্যাপে এটার হদিশ পাওয়া যাবে না।

বৈদ্যুতিক আলোর কোন ব্যবস্থা নেই এখানে, সিলিং থেকে শুধু একটা ব্যাটারিচালিত ল্যাম্প ঝুলছে। আর রয়েছে নসোসের সর্বশেষ আবিষ্কার—একটা টানেল, ঢালু হয়ে নেমে গেছে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত, প্রাসাদের আবাসিক এলাকার বাইরে।

পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে সাবধানে এগোল রানা। শুধু যে ঢালু তাই নয়, বাঁকা হয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে সুড়ঙ্গটা। তবে তাড়াহুড়ো করার এখন আর কোন দরকার নেই, টিউলিপকে নিয়ে পালাতে পেরেছে রানা।

টানেলের মুখ দেখা গেল। এক মিনিট পর খোলা বাতাসে বেরিয়ে এল ওরা।

রানার পিছনে, পাহাড়ের মাথায় ফ্লাডলাইট জ্বলছে। সামনে শুধু অন্ধকার—চাঁদ আছে বটে, কিন্তু এই মুহূর্তে মেঘে ঢাকা পড়েছে। টানেলের মুখ থেকে বেশ কিছুদূর ভাল আড়াল পাওয়া গেল। প্রচুর মাটি অনেক দূর পর্যন্ত দশ পনেরো ফিট উঁচু হয়ে আছে। চাকা লাগানো ঠেলাগাড়ি গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। নদীর কিনারা আড়াল করে আছে সাইপ্রেস গাছের সারি।

তীরে একটা বোট, ঢেউয়ের দোলায় একটু একটু দুলছে। সাধারণ একটা নৌকো, ইঞ্জিন নেই। রশি টেনে নৌকোটাকে কাছে আনল রানা। ঘাস থেকে দু'হাতে তুলল টিউলিপকে। নৌকার পাটাতনে শুইয়ে দিল তাকে।

নোঙর তুলল রানা। স্রোতের টানে খানিকদূর সরে এল নৌকো, তারপর পানিতে বৈঠা নামাল ও। আলো, পুলিস, আর হেনরি পিকেরিঙের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা।

বেশি দূরে নয়, রাস্তার পাশে জঙ্গলে রানার একটা গাড়ি লুকানো আছে।

সাত

পায়চারি করতে করতে ভোর হয়ে গেল।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীট পাহাড়ের মাথায় সূর্য উঠতে দেখছে পিকেরিং। তার পিছনের একটা টেবিলে রেডিও সেটটা রয়েছে, সারারাত কেটে গেল একবারও জ্যান্ত হয়ে ওঠেনি। রাস্তায়, নসোসের দু'পাশে, নিজের দু'জন এজেন্টকে

পাহারায় রেখেছে পিকেরিং, তারা কোন রিপোর্ট করেনি। রিপোর্ট করার কিছু থাকলে তো। পুলিস অবশ্য খুব ছুটোছুটি করেছে, তাও সারারাত নয়।

হতে পারে রানা হয়তো এখনও ধ্বংসাবশেষের ভেতর রয়ে গেছে, ভাবল পিকেরিং। রানা হয়তো প্ল্যান করেছে ঘণ্টা কয়েক পর ট্যুরিস্টদের জন্যে গেট খুলে দিলে তখন পালাবার চেষ্টা করবে। সম্ভব, কিন্তু মনে হয় না। রানার কাজের ধারা ওরকম নয়। সে জানবে, ট্যুরিস্টদের জন্যে গেট খোলার পরও পুলিস থাকবে। সাদা পোশাকে লক্ষ্য রাখবে তারা। উঁহুঁ, আরও নিরাপদ কোন পথ ব্যবহার করবে রানা।

হয়তো পথটা এরই মধ্যে পেয়ে গেছে সে। পিকেরিঙের কাঁধ ঝুলে পড়ল। জানালা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু গাল দিচ্ছে অবিরাম–রানাকে নয়, নিজেকে। একটা দরজা খোলার আওয়াজ হওয়ায় তার মরা-বাপ এতক্ষণে রেহাই পেল।

সারটভ।

'ধরেই নিচ্ছি নতুন কিছু ঘটেনি?'

মাথা নেড়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল পিকেরিং।

'তারমানে তুমি ফেল করেছ।'

ঝট্ করে ফিরল পিকেরিং। 'ফেল? বিচারটা কে করে?'

'আমি নই,' বলল সারটভ। একটা চেয়ারে বসল সে। 'এইমাত্র মস্কোর সাথে যোগাযোগ করেছিলাম।'

বুকের ভেতর কিসের একটা মোচড় আর গড়াগড়ি অনুভব করল পিকেরিং, চিনতে পারল সে, ভয়ের অনুভূতি। মনের জোর খাটিয়ে ঝেড়ে ফেলল সেটা। 'আমি বলব এখুনি তার কোন দরকার ছিল না।'

'হয়তো।' কাঁধ ঝাঁকাল সারটভ। 'কিন্তু ওরা যে তোমার

ওপর খুব খুশি নয় সেটা পরিষ্কার জানা গেছে। ওদের দৃষ্টিতে তুমি এখন একটা...বোঝা। সুতো ওরা কেটে ফেলতে চাইছে।'

'তাই? স্রেফ চোখ উল্টে নেবে?'

মাথা ঝাঁকাল সারটভ। 'স্বীকার করি, সিদ্ধান্তটা রূঢ়।'

'রূঢ়? বলো, মৃত্যুদণ্ড! আশ্চর্য, আর কি চায় ওরা? ওদের আমি অ্যারো, এগম্যান, মেরিলিনকে পাইয়ে দিয়েছি। সম্ভবত রানাকেও, তাই না?'

'তা বটে,' বলল সারটভ। 'মস্কো সেজন্যে তোমার ওপর কৃতজ্ঞ। কিন্তু ওরা তোমাকে যে অ্যাসাইনমেণ্ট দিয়েছিল সেটায় তুমি ব্যর্থ হয়েছ: সি.আই.এ-র ডিরেক্টর পদে কে.জি.বি.-র একজন এজেণ্ট। শুধু যে অ্যাসাইনমেণ্টে ব্যর্থ হয়েছ তাই নয়, নিজের বেলুনও তুমি ফাটিয়ে দিয়েছ, ফাঁস হয়ে গেছ তুমি। তোমার হাত খালি, মুঠোয় কিছুই নেই যে দর কষবে।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড রাশিয়ান লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল পিকেরিং। তারপর হঠাৎ গভীর হতাশায় মুষড়ে পড়ে দ্রুত, অস্থিরভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। 'সত্যি, ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছিলেন,' রানার বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল তার। 'মস্কো থেকে তাগাদা, ওয়াশিংটনের মন যোগানো—সত্যি ভারী কঠিন কাজ।' কঠিন বটে, কিন্তু এতদিন সুষ্ঠুভাবেই করে এসেছে সে।

বিপর্যয়টা উপলব্ধি করতে পারল পিকেরিং—একসাথে দু'পক্ষকে হতাশ করেছে সে। মস্কো তার ব্যর্থতায় অসন্তুষ্ট, ওয়াশিংটন তার বেঈমানীতে হতভ'। দু'পক্ষই এখন তার গর্দান নিতে চাইবে।

রাতে সারটভের কাছ থেকে সব শুনেছে পিকেরিং। গোটা ব্যাপারটা চমৎকারভাবে সাফল্যের দিকে এগোচ্ছিল। পিকেরিঙের প্ল্যান সফল হতে যাচ্ছে দেখে মস্কো উল্লাস বোধ করছিল। পিকেরিং কোণঠাসা করে ফেলেছিল জেফ রিকার্ডকে। সাহায্যের

জন্যে সত্যি সত্যি জেফ রিকার্ড রাশিয়ানদের কাছে গিয়েছিলেন–দূতাবাসের পোলোনভের কাছে। বলাই বাহুল্য, পোলোনভ ঘটনাটা মস্কোকে জানায়। জেফ রিকার্ড পিকেরিংকে সন্দেহ করছে, মস্কোর জন্যে এটুকু জানাই যথেষ্ট ছিল।

মাথার চুলে ঘন ঘন আঙুল চালাল পিকেরিং। কে জানত এমনটি ঘটবে।

শেষরক্ষার নিশ্চয়ই কোন না কোন উপায় আছে।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল সে। মাথায় একটা আইডিয়া এল। আছে, উপায় আছে। প্ল্যান একই থাকবে, একটু শুধু রদবদল দরকার। সারটভের দিকে ফিরল সে। 'আবার যোগাযোগ করো মস্কোর সাথে,' বলল সে। 'ওদের বলো, অ্যাসাইনমেণ্ট এখনও সফল করা যায়।'

'কিভাবে?'

'প্ল্যান একটু বদলে। মেয়েটাকে উদ্ধার করে তাকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব। তবে সমস্ত দোষ চাপাব রানার ওপর।'

'রানার ওপর? কিন্তু জেফ রিকার্ডকে কি বলবে? তার সাথে তোমার দীর্ঘ সময় যোগাযোগ নেই। তার কি ব্যাখ্যা দেবে? তাকে তুমি কিভাবে সামলাবে?'

'টিউলিপকে নিয়ে বাড়ি ফিরলে সে কিভাবে সামলাবে আমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল পিকেরিং। 'জেফ রিকার্ড আমাকে সন্দেহ করে, কিন্তু কিছুই সে পরিষ্কার জানে না। টিউলিপকে বাবা-মার হাতে তুলে দিয়ে আমি তার সন্দেহ দূর করব। অন্তত এতে করে, খানিকটা জটিলতা সৃষ্টি হবে। তারপর আমি তার সন্দেহ রানার দিকে ফেরাব।'

'আর রানা, স্বভাবতই, মারা যাবে।'

'অবশ্যই। যোগাযোগ না করার কারণ হিসেবে বলব, যখন জানতে পারলাম টিউলিপকে রানা কিডন্যাপ করেছে,

সি.আই.এ-র সাথে সমস্ত যোগাযোগ কেটে দিই আমি, কারণ আমি আগে থেকেই জানতাম সি.আই.এ-তে রানার অনেক বন্ধু আছে। জেফ রিকার্ড তাদের মধ্যে একজন নয়, আমার জানা ছিল না। কি করতে হবে আমি বুঝতে পারিনি।'

এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল সারটভের ঠোঁটে। 'বলা যায় না, এতে কাজ হতে পারে।'

'কাজ হতেই হবে!' জোর দিয়ে বলল পিকেরিং।

'তবে, কাজ হবে কি হবে না নির্ভর করছে রানাকে তোমার খুঁজে পাবার ওপর।'

'ওরা যদি আমাকে সময় দেয়, রানাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব। জানোই তো, এখনও সি.আই.এ-তে আমার লোকজন আছে। ওখানে ওদের আমি ঢুকিয়েছি। ওরা সবাই এখনও আমার প্রতি বিশ্বস্ত।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সারটভ। তারপর শ্রাগ করল সে। 'ঠিক আছে, দেখব ওরা কি বলে।'

মাথা ঝাঁকাল পিকেরিং। পরম স্বস্তিবোধ করল সে। এই প্রস্তাব মস্কোকে মেনে নিতে হবে। সারটভ কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, জানালার দিকে পিছন ফিরে তার চলে যাওয়া দেখল সে। এরই মধ্যে রানাকে নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। কি করবে রানা, কি করতে পারে?

রানাকে তার পেতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। পেতে হবে টিউলিপ কনওয়েকে। এরও কোন বিকল্প নেই। চার বছরের একটা বাচ্চা, পিকেরিঙের শেষ আশা। বেঁচে থাকার একমাত্র অবল'ন।

এথেন্সে সকাল হলো, গ্রীক ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর এখনও তাঁর অফিসে বসে আছেন। সামনের চেয়ারে আরেকজন লোক

রয়েছে। দু'জনের মাঝখানে ডেস্কে, একটা রিপোর্ট।

রিপোর্ট থেকে চোখ তুলে এজেন্ট লোকটার দিকে তাকালেন ডিরেক্টর। দ্রুত, ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকালেন। তারপর ক্রেডল থেকে তুলে নিলেন রিসিভার।

মহাসাগর পেরিয়ে আরেক মহাদেশের সাথে যোগাযোগ হলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে সরাসরি হোয়াইট হাউসের লাইন পেলেন তিনি। আরও এক মিনিট লাগল অপরপ্রান্তে জেফ রিকার্ডকে পেতে।

'হেনরি পিকেরিঙের সন্ধান পাওয়া গেছে, মি. রিকার্ড,' গ্রীক ইন্টেলিজেন্স চীফ বললেন। সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি।

কাইরাটস নদীতে মাছ ধরছিল এক জেলে। নসোস ধ্বংসাবশেষে বারবার উজ্জ্বল আলো জ্বলতে নিভতে দেখে তার সন্দেহ হয়। তার মাছ ধরা শেষ হয়েছিল, ফেরার পথে পুলিসকে ব্যাপারটা জানায় সে। হেরাক্লিয়ন পুলিস সাথে সাথে সেখানে একটা পেট্রল কার পাঠায়।

নসোসে পৌঁছে পুলিস দেখে অজ্ঞান করে গার্ডদের হাত-পা বেঁধে রাখা হয়েছে। পরে জানা যায়, ইঞ্জেকশন পুশ করে তাদের অজ্ঞান করা হয়েছিল। পুলিস অফিসার বড় ধরনের বিপদ আশঙ্কা করে আরও পুলিস চেয়ে রেডিও সিগন্যাল পাঠায় হেরাক্লিয়নে।

একজন লোক, আমেরিকান, দু'জন পুলিসকে খুন করে বেড়া টপকে পালিয়েছে। বেড়ার বাইরে তার গাড়ি ছিল। ধ্বংসাবশেষ সার্চ করে একটা লাশ পাওয়া গেছে—মেয়ের। সন্ধান নেয়া হয়েছে, কিন্তু তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এথেন্সে রেকর্ড করা নেই। নমুনা পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওয়াশিংটনের পথে।

'কিন্তু,' গ্রীক ইন্টেলিজেন্স ডিরেক্টর বললেন, 'ফটো দেখে লোকটাকে আমরা চিনতে পেরেছি। হেনরি পিকেরিং। না, কোন

সন্দেহ নেই। তবে দুঃখের বিষয়, আমরা জানি না তিনি এখন কোথায়।'

অপরপ্রান্ত থেকে জেফ রিকার্ড কথা বললেন।

তারপর আবার মুখ খুললেন গ্রীক চীফ, 'আরও একটা ব্যাপার। ধ্বংসাবশেষে আরেকজন লোককে দেখা গেছে। দেখা গেছে বললে ভুল হবে; সে একজন পুলিসকে আহত করে। লোকটা কে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। তবে হেনরি পিকেরিং পালাবার আগে একটা নাম ধরে ডাকেন। আমার এজেন্টের মুখে শুনেছি, নামটা ছিল—রানা।'

ওয়াশিংটনে ভুরু কুঁচকে উঠল জেফ রিকার্ডের। রানা? তারপর, অকস্মাৎ, তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। রানা?

হ্যাঁ, অবশ্যই! কিংবদন্তীর নায়ক মাসুদ রানা! ইণ্ডিয়ান স্প্রিঙে ঢুকে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করার সাহস বা স্পর্ধা একমাত্র তারই থাকতে পারে। বিদ্যুৎ চমকের মত রানার অতীত রেকর্ডগুলো এক এক করে মনে পড়ে গেল তাঁর। এই তো সেই কাপু উ-সেনকে খুন করেছিল? এই তো সেই রানা, রাশিয়া থেকে মিগ-৩১ চুরি করে এনেছিল? মেরিলিন চার্ট এনে দিয়েছে—মাসুদ রানাই তো!

পিকেরিঙের সাথে যোগাযোগ ছিল রানার। মেরিলিন চার্ট সংগ্রহ করার কাজটা রানা নাকি নিতে চায়নি, বুঝিয়ে-শুনিয়ে পিকেরিংই তাকে রাজি করিয়েছিল। দু'জনের মধ্যে একটা ভাল সম্পর্ক না থেকেই পারে না। পিকেরিংই তো অসলোয় গিয়েছিল, যেখানে রানা মারা গেছে বলে রটানো হয়েছিল। পিকেরিংই লাশটা সনাক্ত করার ব্যবস্থা করে।

রানা তাহলে মারা যায়নি!

ফোনের রিসিভার রেখে দিয়ে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। 'বলতে আমার ঘৃণা হচ্ছে,' থমথমে গলায় বললেন

তিনি, 'কিন্তু না বলেও পারছি না। বিকট একটা সমস্যায় পড়ে গেছি আমরা। তোমার মেয়ে কার কাছে আছে আমি জানি। বিদেশী এক ভয়ঙ্কর লোকের হাতে।'

'কে সে? কি চায় সে? কে তার বস্? কার হয়ে কাজ করছে ইডিয়েটটা?'

'তার নাম মাসুদ রানা,' জেফ রিকার্ড বললেন। 'সম্ভবত কারও হয়েই কাজ করছে না। মুশকিল হলো, সে যদি স্বেচ্ছায় ধরা না দেয়, তাকে ধরা প্রায় অসম্ভব বলে মনে করি আমি। তার অতীত রেকর্ড জানি বলেই এ-কথা বলছি।'

'সি.আই.এ...'

প্রেসিডেন্টকে থামিয়ে দিয়ে সি.আই.এ. চীফ বললেন, 'সি. আই.এ. দিয়ে কাজ হবে না, রিচার্ড। তবে, একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি, টিউলিপের কোন ক্ষতি মাসুদ রানা করবে না। সারা দুনিয়ায় এ-ই একমাত্র স্পাই, ফুল ছেঁড়া যার স্বভাব নয়।'

স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ডেভিড কপারের, তা প্রায় এক বছর হলো। নির্জনতা ভালবাসে, তাই হেরাক্লিয়ন শহরের একধারে আশ্রয় নিয়েছে সে। বাড়িটার সামনে, রাস্তার পাশে ঘাসের ওপর গাড়ি থামিয়ে রানা ভাবল, হয়তো সুসানের সাথে বিয়েটা টিকল না বলেই সি.আই.এ. ছেড়ে চলে আসে কপার।

কিংবা তার ধারণা সি.আই.এ-র চেয়ে এয়ারফোর্সের চাকরিতে অনেক বেশি নিশ্চয়তা আছে।

ডিভোর্সের পর কপারের সাথে রানার আর দেখা হয়নি। তবে টেলিফোনে দু'একবার আলাপ হয়েছে, জানে হেরাক্লিয়ন ইউ.এস. এয়ারফোর্স বেসে ডিউটি করে সে, কিন্তু বাস করে বেসের বাইরে। পুরানো বন্ধু, দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও খবরাখবর রাখতে

হয়।

ওকে দেখে নিশ্চয়ই ভূত দেখার মত চমকে উঠবে কপার।

গাড়ি থেকে নামার আগে পিছনের সীটের নিচে ওর আরোহীকে ভাল করে একবার পরীক্ষা করল রানা। নিচে নেমে তালা দিল দরজায়। লন পেরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। প্রথমে একবার, দশ সেকেণ্ড বাদে পরপর দু'বার চাপ দিল কলিং বেলের বোতামে।

বাড়ির ভেতর আলো জ্বলে উঠল। দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে কপার। এরপর আলোকিত হলো পোর্চ। খুলে গেল দরজা।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ডেভিড কপার। খালি পা, গায়ে পুরানো একটা বাথরোব। সেই আগের চেহারা, একটুও বদলায়নি। লম্বা কালো চুল, রানার সমান লম্বা, মায়াভরা চোখ। আর সেই অতি পরিচিত ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

কিছুই বলল না কপার, স্রেফ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল চোখ জোড়া, ঝুলে পড়ল চোয়াল। 'শালা ঘাড় মটকাতে এসেছে।'

'সুযোগ দেয়ার জন্যে ঘরে ডাকো,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'কিংবা পোর্চের আলোটা অন্তত নেভাও।'

'রানা!' উল্লাসে ফেটে পড়ল কপার। বিশাল পাখির মত উড়ে এল সে রানার গায়ে। সজোরে জাপটে ধরে পিষতে লাগল বন্ধুকে বুকের সাথে। 'আরে, এ যে দেখছি রক্তমাংসের মানুষ!' দ্রুত একবার রাস্তার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল সে—অভ্যেস। মাসুদ রানা মানেই তো মূর্তিমান বিপদ।

জড়িয়ে ধরে রেখে রানাকে ভেতরে নিয়ে এল সে। বোকা নয় অথচ বোকার মত হাসছে। 'হায় ঈশ্বর, এরপরও কি করে বিশ্বাস করি, ইডিয়েটটা মরে গেছে!'

‘বুঝতেই পারছ, যারা রটিয়েছে আর যারা বিশ্বাস করেছে তারাই ইডিয়েট।’

‘গাল দাও, মারো, যা খুশি করো, কিন্তু মোরো না, ভাই!’ রানাকে ছেড়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করল কপার, আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল রাস্তার ওপর। ‘কিন্তু এই অসময়ে এখানে তুমি কি করছ বলো তো?’

‘সে এক লম্বা কাহিনী। আগে এক কাপ কফি খাওয়াও দেখি,’ বলল রানা।

‘শুধু কফি? ঠিক আছে, আপাতত কফিই চলুক। সারারাতই তো পড়ে আছে, মদের মধ্যে গড়াগড়ি খাব দু’জনে। মৃত বন্ধুকে ফিরে পাওয়া ক’জনের ভাগ্যে ঘটে—সেলিব্রেট করব না!’

মুচকি হেসে কপারের পিছু পিছু কিচেনে ঢুকল রানা।

হাতে কফির কাপ নিয়ে পুরানো দিনের গন্ধে মেতে উঠল দুই বন্ধু। কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে উঠল কপার, নিচু গলায় জানতে চাইল, ‘সোহানার খবর কি?’

‘আছে আর কি... ।’

‘নিশ্চয়ই ভাল নেই...’

চট্ করে তাকাল রানা। ‘তোমার এ-কথার মানে?’

‘এমন একজনকে ভালবাসে বেচারি যাকে বিয়ে করা যাবে না—ভাল থাকে কি করে?’ এদিক ওদিক মাথা নাড়ল কপার। ‘তুমি যে একটা কি! ঈর্ষা হয়, বুঝলে, ঈর্ষা হয়। ওরকম একটা মেয়ে আমাকে যদি ভালবাসত, তার জন্যে স্রেফ জান দিয়ে দিতাম।’

প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইল রানা। ‘হেনরি পিকেরিংকে ইদানীং দেখেছ নাকি?’ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও।

‘পিকেরিং? হেল, নো। ও-সব থেকে একেবারেই বেরিয়ে এসেছি আমি। বোধহয় এখনও সে ল্যাংলির ডেস্কে আঠার মত

আটকে আছে।'

'সব সময় নয়। মাঝে মধ্যে ফিল্ডেও তাকে দেখা যায়।'

'ইন্টারেস্টিং!'

'যোগ্য লোক।'

'এসপিওনাজ জগতের সেরা,' বলল কপার। 'অবশ্য এখন ওকে বুড়োই বলা যায়।' রানা আর কপারের বয়সের ব্যবধান অনেক হলেও বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে কোন অসুবিধে হয়নি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে। অত্যন্ত যোগ্য এজেন্ট ছিল কপার। পিকেরিঙের সাথে তার বয়সের ব্যবধান খুব বেশি নয়।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'মাঠে কাজ করার জন্যে তার বয়স একটু বেশি হয়ে গেছে। তাছাড়া, লোকটাকে আমার কোন দিনই খুব একটা পছন্দ হয়নি। আমি তাকে বিশ্বাস করি না।'

কপারের মুখের হাসি দপ্ করে নিভে গেল। বোকার মত তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। তারপর সে তার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়িতে হাত বুলাল। 'কথাটা আরেকবার বলো।'

'ঠিকই শুনেছ,' আশ্বস্ত করল রানা।

'মাই গড! কি বলছ তুমি, রানা!'

'ঠিকই বলছি। হেনরি পিকেরিংকে আমি বিশ্বাস করি না।'

হঠাৎ হেসে উঠল কপার। 'ওহ্-হো! ভুলেই গিয়েছিলাম। ওটা তো তোমার একটা বৈশিষ্ট্য। কাউকে বিশ্বাস না করা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।'

মুচকি হাসল কপার। 'অবশ্যই, যতক্ষণ তোমার চোখের সামনে থাকি! বাট ক্রিস্ট! পিকেরিং? সে ডেপুটি ডিরেক্টর!'

'জানি।'

যা জানার ছিল জেনে নিয়েছে রানা। কপারের সাথে যোগাযোগ নেই পিকেরিঙের। হাত নেড়ে বিরক্তিসূচক একটা ভঙ্গি

করল ও, যেন এ-প্রসঙ্গে তার আর কোন আগ্রহ নেই। কফির কাপে চুমুক দিল। 'সুসান কেমন আছে?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল লক্ষ করে থাকলেও কপালের চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। 'সুসান, তাই না?' তিক্ত হাসল সে। 'ভরণপোষণের জন্যে মাসে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা গুনতে হচ্ছে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলতে পারো।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে, টেবিলে কনুই, দু'হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দেরাজের ভেতর থেকে দুটো অ্যাসপিরিন বের করল। ট্যাবলেট খেয়ে টেবিলে ফিরে এল আবার। 'সুসানের নামটা শুনেই মাথা ধরে গেল। শেষ খবর জানি, পাঁচ ছেলের বাপ এক পেইন্টারের সাথে ঢলাঢলি করছে। প্রথমে পালা করে আমার সব ক'জন বন্ধুর সাথে শুয়েছে, তুমি বাদে। বাদ দাও ওর কথা। তবে একটা কথা জানি, ও আবার বিয়ে না করা পর্যন্ত আমার ধনী হবার কোন সম্ভাবনা নেই।' কথা শেষ করে আবার চেয়ার ছাড়ল সে। টলতে লাগল।

দেখেও রানা কিছু বলল না।

'হলো কি আমার!'

'আবার বুঝি রাত জাগছ?'

চেষ্টা করে একটু হাসল কপার, যেন দুষ্টামি করে ধরা পড়ে গেছে। টেবিল থেকে দূরে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসল সে।

'এয়ারফোর্স কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল। দু'বেলা দু'ঘণ্টা করে ডিউটি, বাকি সময় স্বাধীন। সামান্য উত্তেজনা। ভাল এই জন্যে যে কাছাকাছি সুসান আছে এই অনুভূতিটা নেই।'

'গুড।'

'জেসাস! কি ঘটতে চলেছে!'

তারপর হঠাৎ মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে

পারল। চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু খানিকটা উঠে আর পারল না। চোখের দৃষ্টি ভোঁতা হয়ে আসছে, যেন অনেক দূরে তাকিয়ে আছে। 'কফির সাথে, তাই না?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কি জিনিস?'

'স্থায়ী কিছু নয়,' বলল রানা। পকেটে হাত ভরে খুদে আকৃতির একটা পিল বের করে দেখাল কপারকে। ডিয়াটল, হেরাক্লিয়নের একটা ফার্মেসি থেকে চুরি করা। চুরি ধরা পড়লে ফার্মেসির মালিক থানায় রিপোর্ট করবে বলে মনে হয় না। দু'চারটে ট্যাবলেট চুরি হলে কে আবার থানা-পুলিস করতে যায়।

'ক'টা?' জানতে চাইল কপার।

'দু'দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখার জন্যে যথেষ্ট। ঘুম ভাঙার পর দারুণ ভাল লাগবে তোমার। আমার কথা কেউ জিজ্ঞেস করলে তোমাকে মিথ্যে কথা বলতে হবে না। দু'দিনের মধ্যে এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাব আমি।'

'ধন্যবাদ।' দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ছে কপার। ঘাড়ের ওপর মাথা সোজা রাখতে পারছে না। আর মাত্র একটা প্রশ্ন করল সে, 'কেন?'

'দুঃখিত, কপার, সব বলার মত সময় নেই হাতে। আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। খুব দরকার ছিল বলে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে আমাকে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ...'

'আমারও তাই ধারণা,' কথাগুলো জড়িয়ে এল কপারের। 'গুরুত্বপূর্ণ না হলে...' এক ছুটে তার কাছে চলে এল রানা, চেয়ার থেকে কপার পড়ে যাবার আগেই তাকে ধরে ফেলল।

কাঁধে ফেলে অজ্ঞান দেহটাকে দোতলায় নিয়ে এল রানা। বেডরূমে ঢুকে বিছানায় শুইয়ে দিল। কপারের চাবি নিয়ে বাড়ি

থেকে বেরিয়ে এল ও। গ্যারেজটা পিছন দিকে, রাস্তা থেকে দেখা যায় না। গাড়িটা ছোট একটা সাদা ফিয়াট। সেটা বের করে, গ্যারেজে নিজেরটা ঢুকিয়ে রাখল রানা। তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল টিউলিপকে।

দু'ঘণ্টা পর ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল রানা। 'ক্যাপটেন ডেভিড কপার বলছি। আজ যেতে পারব না বলে ফোন করছি। মনে হয় ফ্লু হয়েছে আমার।'

'শুনে দুঃখ পেলাম, স্যার,' অপরপ্রান্ত থেকে ডিউটি অফিসার বলল। 'আপনার সেকশনকে এখুনি আমি জানিয়ে দিচ্ছি।'

'ধন্যবাদ।' কাশতে কাশতে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। টিউলিপকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে, কপারের ফিয়াটে উঠে স্টার্ট দিল।

হেরাক্লিয়ন এয়ারপোর্ট টার্মিন্যালে ঢোকার মুখে ধূসর রঙের একটা মার্সিডিজ দাঁড়িয়ে আছে, প্যাসেঞ্জার সীটে বসে রয়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একজন এজেন্ট। একই দরজার কাছে পিঠে আরও ছয়জন ব্রিটিশ এজেন্টের ডিউটি পড়েছে। বাকি তেরো জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দিচ্ছে এয়ারপোর্ট ভবন, মেইন গেট, লাউঞ্জ, টিকেট কাউন্টার এবং ডিপারচার লাউঞ্জ।

ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স এম-সিক্সটিন-এর এজেন্ট ওরা সবাই, হেরাক্লিয়ন আর চানিয়া এয়ারপোর্ট পাহারা দেয়ার দায়িত্ব বর্তেছে ওদের ওপর। অন্যান্য এজেন্সির লোকেরা বন্দর, রাস্তা, যানবাহন, হোটেল, কাস্টমস ইত্যাদি পাহারা দিচ্ছে। ক্রীট থেকে হাজার হাজার লোক বেরিয়ে যাচ্ছে, তাদের সবার মুখের ওপর চোখ বুলানো হচ্ছে। কিন্তু মাসুদ রানা এখনও কারও চোখে ধরা পড়েনি।

মাসুদ রানা। মার্সিডিজে বসে লোকটা ভাবল, কে এই মাসুদ

রানা? কি করেছে সে? নিশ্চয় সাংঘাতিক একটা কিছু হবে। প্রথমে বলা হলো, হেনরি পিকেরিংকে খোঁজো, এখন আবার নতুন একজন যোগ হলো–মাসুদ রানা। যতটুকু শুনেছে সে, পাহারা শুধু ক্রীটেই বসানো হয়নি। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে চলেছে, ভয়ঙ্কর আর গোপনীয়। সরাসরি ফরেন অফিস থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের।

কিন্তু ফরেন অফিস নির্দেশ পেল কোত্থেকে? ডাউনিং স্ট্রীট? নাকি হোয়াইট হাউস থেকে? আয়োজনের বহর, আর জরুরী হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকেও এসে থাকতে পারে নির্দেশটা। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাবার আলামত কিনা কে জানে!

তার গাড়ির ডান দিক ঘেঁষে একজন ইউ.এস. এয়ারফোর্স অফিসার হেঁটে গেল। হয়তো এই লোকটার ওপরও নজর রাখা হচ্ছে, ভাবল ব্রিটিশ এজেন্ট। কিংবা এই লোকটার ওপরও দায়িত্ব বর্তেছে সবার ওপর নজর রাখার। কে যে নজর রাখছে না, বলা কঠিন। এয়ারপোর্টে নাকি তারা শুধু একা নয়, গ্রীক ইন্টেলিজেন্স এজেন্টরাও তৎপর। নিশ্চয়ই আমেরিকানরাও ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে আছে। দু'জন ইসরায়েলী এজেন্টকে তো চিনতেই পেরেছে সে।

সবাই নজর রাখছে, কিন্তু মাসুদ রানার কোন পাত্তা নেই। না মাসুদ রানার, না হেনরি পিকেরিঙের। আচ্ছা, সি.আই.এ. কি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নাকি? তা না হলে হেনরি পিকেরিঙের মত লোককে...সেই তো সি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর!

নাহ্, ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব গুরুতর।

এয়ারফোর্স অফিসার টার্মিনাল ভবনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এই সময় মার্সিডিজ থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙল সে। মুখের সামনে হাত তুলে লম্বা হাই তুলল। বসে থাকলে ঘুম পায়,

একটু হাঁটাহাঁটি করা যাক। এই মাত্র একটা এয়ারপোর্ট বাস এল, আরোহীদের নামিয়ে দিল টার্মিনাল ভবনের সামনে। আরও পঞ্চাশ জন লোক। পরীক্ষা আর প্রশ্ন করে দেখা যাবে, এরা কেউ নয়।

আবার এদের মধ্যেই থাকতে পারে মাসুদ রানা। এমন কি গর্ভবতী ওই মেয়েলোকটাও হতে পারে হেনরি পিকেরিং! কিন্তু পিকেরিং বা রানা সন্দেহ করে এদের সবাইকে ঘেরাও করতে পারে না তারা। সবাইকে যদি আলাদা করে জেরা আর পরীক্ষা করা হয়, দশ বছর সময় লাগবে।

আরেকটা হাই তুলে বাসটার দিকে পিছন ফিরল লোকটা। ডেভিড কপারের সেক্রেটারির বয়স মাত্র উনিশ, এয়ারফোর্সে নতুন ঢুকেছে। দুনিয়াটা ঘুরে দেখার বড় শখ তার, হেরাক্লিয়নে এসে তার ভালই লাগছে। তবে দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, এখানে তাকে বেশিরভাগ সময় ডেস্কে বসে থাকতে হয়।

'আমি দুঃখিত, ক্যাপটেন ডেভিড কপার আজ অসুস্থ,' ফোনের অপরপ্রান্তের যুবতীকে বলল সে। 'কাল রাতে তিনি ন্যাটো রিপোর্ট বাড়িতে নিয়ে গেছেন, কিন্তু আজ তিনি আসছেন না।'

যুবতীও একজন সেক্রেটারি, কিন্তু উঁচু পদের। বেসের কমাণ্ডিং অফিসারের কাজ করে সে। 'তাহলে কাউকে তার বাড়িতে পাঠাতে হবে,' নির্দেশের সুরে বলল সে। 'ব্রাসেলস একটা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। রিপোর্টটা আজ সি.ও. সাহেবের না দেখলেই নয়।'

কাউকে। যুবক এয়ারম্যান জানে কাউকে বলতে কাকে বোঝানো হলো। 'ইয়েস, ম্যা'ম,' বলল সে, 'এখুনি যাচ্ছি আমি।'

টিকেট কাউন্টারের পিছনে বসা সুন্দরী মেয়েটা মুগ্ধ চোখে

তাকিয়ে থাকল। এমন সুদর্শন পুরুষ সহজে চোখে পড়ে না। খেয়াল হতে লজ্জা পেল সে, লোকটা তার দিকে সবজান্তার হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে। রাঙা মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল সে, বলল, 'আপনি অলিম্পিক এয়ারলাইন্সে এসেছেন, সেজন্যে আমরা কৃতজ্ঞ, ক্যাপটেন কপার।' মনে মনে আরেকবার ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির প্রশংসা করল সে, সুন্দর দাড়ি সুন্দর মুখেই মানায়। 'এই নিন। আমাদের এথেন্স ফ্লাইট আর চল্লিশ মিনিট পর টেক-অফ করবে। রিটার্ন ডেটটা আমি খালি রেখেছি।'

'ধন্যবাদ।' হাসল রানা। ইচ্ছে করেই রিটার্ন টিকেট বুক করেছে ও। নগদ টাকা কোন সমস্যা নয়, সাথে এখনও এক লাখ ডলার রয়েছে। কিন্তু বাইরে কয়েকজন ব্রিটিশ আর ইসরায়েলী এজেন্টকে দেখে এসেছে ও। ভেতরেও নিশ্চয়ই আছে ওরা। তারমানে কিছুই ওরা চেক করতে বাকি রাখবে না–কেউ শুধু একদিনের টিকেট কাটছে কিনা তাও ওরা নির্ঘাত চেক করবে।

কপারের মানিব্যাগ বের করে টিকেটের দাম মেটাল রানা।

'সাত ন'র গেট,' বলল মেয়েটা। 'পৌঁছে দেয়ার জন্যে আপনার সাথে কোন লাগেজ আছে নাকি?'

হাতে ঝুলে থাকা গারমেন্ট ব্যাগটা দেখল রানা। 'না, ধন্যবাদ। এটা আমি নিজেই নিয়ে যেতে পারব।'

অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট, কাস্টমস চেকিঙের কোন ঝামেলা নেই।

যুবক সেক্রেটারি আবার কলিং বেলের বোতামে চাপ দিল। না, তবু কোন সাড়া নেই ভেতর থেকে। বেস থেকে বার কয়েক টেলিফোনও করেছে সে, কেউ রিসিভার তোলেনি। তাহলে? অসুস্থ ক্যাপটেন গেল কোথায়? দরজার সামনে, ধাপের ওপর খবরের কাগজটা পড়ে রয়েছে। তারমানে সত্যি ক্যাপটেন বাড়িতে নেই! রাতটা তিনি অন্য কোথাও কাটিয়েছেন।

অবাক কাণ্ড!

ঘুরে ধাপ ক'টা টপকাল সে, গাড়ির কাছে ফিরে যাচ্ছে। কি মনে করে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ক্যাপটেন না হয় বাড়ি নেই, কিন্তু ন্যাটো রিপোর্টটা? গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট, নিশ্চয়ই বাড়িতেই রেখে গেছেন। সামনে থেকে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল সে।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করতেই কিচেনের একটা জানালা খোলা গেল।

ক্যাপটেনের কিছু বলার থাকবে না, কারণ মিথ্যে অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে ছুটি নিয়েছেন তিনি। ফ্লু হয়েছে, হাহ্! খোলা জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল এয়ারম্যান।

পশ্চিম জার্মানীর এজেন্টে গিজগিজ করছে এথেন্স এয়ারপোর্ট। তিনজনকে দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। হেরাক্লিয়নে ব্রিটিশ আর ইসরায়েলী, এখানে পশ্চিম জার্মানী—ওরে সর্বনাশ!

কারা পাঠিয়েছে ওদের? পিকেরিং?

না। পিকেরিং হলে কে.জি.বি. বা পূর্ব ইউরোপের এজেন্টদের পাঠাত। জেফ রিকার্ড? তাই হবে। জেফ রিকার্ড আর রিচার্ড কনওয়ে যুক্তি করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে—যেভাবে হোক মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করো। মিত্র সবগুলো দেশের ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নাও!

রানা ভাবল, কতক্ষণ ওদের চোখে ধুলো দিয়ে থাকতে পারবে সে? যেন মনে হচ্ছে গোটা দুনিয়াই ওর বিরুদ্ধে চলে গেছে।

টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এল ও। কেউ ওর পথ আটকাল না। কেউ পিছু নেয়নি। ইউনিফর্মটা সত্যিই কাজের। রাস্তার মুখে এসে ট্যাক্সি নিল ও। ড্রাইভারকে বলল, 'ওমোনিয়া স্কয়ার।'

চৌরাস্তায় পৌঁছে ট্যাক্সি নিল রানা, বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটে এগোল। পিছন ফিরে একবারও তাকাল না, শুধু একই রাস্তা দু'বার পেরোল, সার সার দোকানের কাঁচ মোড়া শো-কেসে চোখ রেখে দেখে নিল কেউ ওর পিছু নেয়নি। আধ মাইল হেঁটে পৌঁছে গেল জেনোফোন গ্যালারিতে। মৃদু ঠেলা দিয়ে দরজা খোলার সময় ভেতরে কোথাও সুমধুর বেল বেজে উঠল।

ওকে ঢুকতে দেখে সামনে এগিয়ে এল রোগা-পাতলা এক মহিলা। কপালের ওপর চুলে পাক ধরেছে, চেহারায় অদ্ভুত এক আলিস্যির ভাব, যেন বাস্তব দুনিয়ার প্রতি তার কোন আগ্রহ বা মনোযোগ নেই। আসলে ঠিক উল্টোটা সত্যি, সমস্ত ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর আর মনোযোগ না থাকলে সি.আই.এ. এখানে তাকে দায়িত্ব দিত না। তার গলার সাথে চেইনে একজোড়া চশমা ঝুলছে। শিল্পীসুলভ সাদামাঠা কাপড় পরে আছে, ম্লান মুখ দেখে মনে হয় কত দিন যেন ভাল করে খাওয়াদাওয়া করেনি। রানা জানে, মহিলা সম্পর্কে বলা হয়, পিকাসোর পর আধুনিক আর্ট সম্পর্কে তার চেয়ে ভাল আর কেউ জানে কিনা সন্দেহ।

'মে আই হেলপ ইউ?' জোর করে হাসল মহিলা, নির্লিপ্ত সুরে জানতে চাইল।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'আমি কেলীর সাথে দেখা করতে এসেছি।'

'কেলী।' নামটা উচ্চারণ করে রানার আপাদমস্তক দেখল মহিলা। 'আসুন আমার সাথে, প্লীজ।'

কেলী হেওয়ার্থ গ্যালারির বুককীপার, বসে পিছনের একটা অফিসে। তার গোপন দায়িত্বটা হলো, সি.আই.এ. এথেন্স স্টেশনের আইডেনটিফিকেশন ডিপার্টমেন্ট পরিচালনা করা। কেলীর অনুমতি ছাড়া একটা চামচিকেরও সাধ্য নেই নিচের তলায় নামে।

পেশার খাতিরেই সি.আই.এ. এথেন্স স্টেশনে কে কোথায় কি কাজ করে খোঁজ-খবর রাখতে হয় রানাকে। যেমন ওই পেশার খাতিরেই সারা দুনিয়ায় এমন কিছু লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে রানা যারা হুবহু না হলেও, প্রায় ওর মতই দেখতে। প্রায় সমান লম্বা, চুলের রঙ এক, নাক-চোখ মেলে, চোখের রঙ মেলে, শারীরিক গড়নে তেমন গুরুতর কোন পার্থক্য নেই—এ-ধরনের বন্ধুদের মধ্যে ডেভিড কপারও ছিল একজন। রানা জানে, কেলী হেওয়ার্থ কপারকে চেনে, কিন্তু ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আছে কিনা ওর জানা নেই। ঝাড়া দু'ঘণ্টা ধরে চেহারা বদল করেছে ও, আয়নায় নিজেকে ডেভিড কপার বলেই মনে হয়েছে, কিন্তু কপারের ঘনিষ্ঠ কোন বান্ধবীর চোখে ধুলো দেয়া সম্ভব না-ও হতে পারে।

'ডেভিড! এখানে তুমি কি করছ?'

প্রথম দর্শনে উত্তীর্ণ হলো রানা। মেটাল র‍্যাকে গারমেণ্ট ব্যাগটা রাখল ও, এটায় অফিস স্টাফরা কোট রাখে। তারপর হ্যাট খুলে র‍্যাকের মাথায় রাখল। 'পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হ্যালো বলতে এলাম।'

'এ্যাদ্দিন পর! যাক, একেবারে যে ভুলে যাওনি সেটাই আমার ভাগ্য!' পরমুহূর্তে কেলীর চেহারায় কেমন যেন একটা সন্দেহের ভাব ফুটে উঠল। চেহারা থেকে ভাবটুকু দ্রুত মুছে ফেলে হাসল সে। 'দারুণ দেখাচ্ছে তোমাকে! এয়ারফোর্সে আছ কেমন?'

'আকাশে আকাশে থাকি, মাটির মানুষদের সাথে ঠিক মত যোগাযোগ রাখতে পারি না,' বলল রানা, ডেভিড কপার সম্ভবত ঠিক এ-ভাষাতেই কথা বলত। কিন্তু কেলী সুন্দরী মেয়ে, কাজেই তাকে খুশি করতে হয়। 'তবে তোমার কথা আমার সব সময় মনে থাকে। বিশ্বাস করো, তোমার নাকের পাশে ওই যে তিলটা, আমার বন্ধুরা সবাই ওটার কথা জানে।'

খুশি হলো কেলী, প্রশংসা শুনলে কোন্ মেয়েই বা না হয়!

কিন্তু কেলী শুধু সুন্দরী নয়, বুদ্ধিমতীও। হাসল বটে, হঠাৎ হাসি থামিয়ে প্রশ্ন করতেও ছাড়ল না, 'তোমাকে কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। কেন বলো তো?' তার ভুরু কুঁচকে উঠল। তারপর আবার হাসল সে। 'পেয়েছি! তোমার চশমা!'

'ভাবছিলাম কখন তুমি লক্ষ করবে।'

'স্মার্ট ডেভিড কপার, একচুল বদলাওনি,' কটাক্ষ হানল কেলী। 'ইউনিফর্মের ওপর একটা কাপড় চাপা দাও, ইউরিপিডিস হিসেবে চালিয়ে দেয়া যাবে।'

কেলীর ডেস্কের এক কোণে বসল রানা। 'ইউরিপিডিস কি চশমা পরত?'

শ্রাগ করল কেলী। 'নিশ্চয়ই পরত। কুপি জ্বেলে এত লেখা লিখল কিভাবে? এথেন্সে দিন কয়েক থাকছ তো, না-কি?'

'নির্ভর করছে তোমার ওপর।'

একটা ভুরু উঁচু হলো কেলীর।

'নির্ভর করছে ক'টা লাল ফিতে তুমি খুলতে পারো তার ওপর। তুমি হয়তো শুনেছ, আমাকে এয়ারফোর্স ইণ্টেলিজেন্সে কেরামতি দেখাবার সুযোগ দেয়া হয়েছে?'

'না, শুনিনি; তবে আশ্চর্য হচ্ছি না। তোমার অভিজ্ঞতা ওরা কাজে লাগাতে চাইতেই পারে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা প্রায়োরিটি অ্যাসাইনমেণ্ট দেয়া হয়েছে আমাকে।' গলা খাদে নামাল ও, 'টপ সিক্রেট। কনফিডেনশিয়াল।'

কথা না বলে রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল কেলী।

'টিউলিপ কনওয়ে,' আবার ফিসফিস করে বলল রানা।

কেলীর চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্যে অস্থির হয়ে উঠল! 'ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার, তাই না?'

'ভয়ঙ্কর কি বলছ,' কেলীর দিকে ঝুঁকে গলা আরও খানিক

খাদে নামাল রানা, 'বলো, ডিনামাইট! গত পাঁচ বছরে এরকম সঙ্কটে পড়িনি আমরা। ওকে যদি আমরা তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে না পারি–' কথা শেষ না করে হাত দিয়ে গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করল রানা।

গম্ভীরভাবে মাথা দোলাল কেলী। 'পিকেরিং এথেন্সে এসেছে জানার পরই আমি বুঝতে পারি, সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে। তোমার সাথে দেখা হয়েছে?'

মাথা কাত করল রানা। 'হেরাক্লিয়নে। শোনো বলি, আমাকে একটা ফাইল দেখতে হবে। যদি বাধ্য হই, চ্যানেল ধরেই এগোব আমি। তবে আশা করছি তুমি আমাকে ঝামেলার মধ্যে ফেলতে চাইবে না।'

'কি ফাইল?'

'বলো কার।'

'কার?'

'পল রিজওয়ে।'

'নিশ্চই,' বলল কেলী। 'তার ফাইল তো এমন কি ক্লাসিফায়েডও নয়।'

রানা তা জানে, সেজন্যেই পল রিজওয়ের নামটা বলেছে ও।

'আর তাছাড়া,' আবার বলল কেলী, 'কোন্ সাহসে তোমাকে আমি না বলি? ভাল করেই জানি, ইচ্ছে করলে যে-কোন মুহূর্তে ডিনামাইট দিয়ে গোটা বিল্ডিংটা উড়িয়ে দিতে পারো তুমি।'

'তা পারি,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'যদি দিই, তোমার তখন ডিউটি থাকবে না।'

হেসে ফেলল কেলী। 'পটাতে শিখেছ ভালই। চলো, দেখিয়ে দিয়ে আসি।'

কপালের হ্যাটটা র‍্যাকের মাথা থেকে তুলে নিল রানা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমার এই উপকার আমার মনে থাকবে।'

গারমেণ্ট ব্যাগটাও হাতে নিল ও। 'আশা করা যায়, প্রেসিডেণ্টও ভুলে যাবেন না।'

আরও কিছু কাজ সারল রানা। দু'ঘণ্টা পর ডেভিড কপারের নাম লিখে হোটেল অ্যামব্যাসাডরে কামরা ভাড়া করল। এক রাতের টাকা অগ্রিম দিল।

অ্যামব্যাসাডর পরিষ্কার হোটেল, সার্ভিস চার্জও বেশি নয়। একা যতক্ষণ থাকবে, আশা করা যায় নিরাপদেই থাকবে টিউলিপ। আরেকটা সুবিধে হলো, হোটেলটার পিছন দিকে দরজা আছে, চুপিচুপি আসা-যাওয়া করতে পারবে রানা।

গারমেণ্ট ব্যাগ থেকে বের করে বিছানায় শোয়াল টিউলিপকে। ভাঁজ খুলে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিল চাদরে। নিজের স্বার্থেই টিউলিপকে এখন হারিয়ে ফেলা চলবে না রানার। একমাত্র টিউলিপই ওর বেঁচে থাকার গ্যারাণ্টি। কিন্তু আরেক অর্থে, টিউলিপ একটা বোঝাও বটে। তার চেহারা বদলানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। প্রতি পদে ওকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে সে, মন্থর করে দিচ্ছে গতি। সাথে যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ধরা পড়ার ভয়। সাথে না থাকলে অনায়াসে হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে রানা। টিউলিপকে নিয়ে তা সম্ভব নয়।

মেঝেতে পায়চারি শুরু করল রানা। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে। নিঃসঙ্গ, অসহায় হয়ে পড়েছে ও। বি.সি.আই. বা রানা এজেন্সির সাহায্য নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, কারণ জেফ রিকার্ড সব ক'জন এজেণ্টের ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে।

জীবনের সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছিল অ্যাসাইনমেণ্টটা। কেঁচে গেছে। প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার সাথে সাথে অ্যাসাইনমেণ্টের ধরনটা বদলে গেছে সম্পূর্ণ। দু'ভাগ হয়ে গেছে শত্রুপক্ষ, দু'পক্ষই খুঁজছে ওকে। বাস্তব পরিস্থিতি হলো, গোটা

এসপিওনাজ জগৎটাকেই ওর পিছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে।

নিজেকে রানা স্মরণ করিয়ে দিল, কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না।

পিকেরিঙের কথা ভাবল ও। কে.জি.বি. তো তাকে সাহায্য করছেই, সি.আই.এ-রও একটা অংশ তার অনুগত। টিউলিপ যতক্ষণ রানার কাছে থাকবে, পিকেরিং ওকে বাঁচতে দেবে না।

আরও বড় হুমকি জেফ রিকার্ড। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধিত্ব করছেন তিনি। রানাকে দেখামাত্র খুন করার নির্দেশ দিতে পারেন। জীবিত ধরা পড়লে বিচারের ব্যবস্থা করবেন।

কপালে কি আছে কে জানে! ইলেকট্রিক চেয়ার? নাকি যাবজ্জীবন? কারাগারে বেঁচে থাকার চেয়ে মাটির নিচে ঘুমিয়ে থাকতেই পছন্দ করবে ও।

নিজের জন্যে কোন্‌টা ভাল জানে রানা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে টিউলিপকে তুলে দিয়ে গায়েব হয়ে যাওয়া। অন্য আর সব কিছু বোকামি।

কিন্তু বাধা রয়েছে দুটো। কারও ওপর বিশ্বাস নেই ওর, কাজেই টিউলিপকে কারও হাতে তুলে দেয়া যায় না। আরেকটা বাধা হলো গর্ব। পেশাগত একটা গর্ব। সবারই থাকে। ওর বুদ্ধিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, এক হাত না দেখিয়ে ছাড়বে না ও। পিকেরিংকে পরাজিত হতে দেখতে চায়। শেষ করতে চায় কাজটা। শেষ করতে চায় ন্যায্য ভাবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চেয়ে পিকেরিং অনেক বেশি শক্তিশালী, তাদের হাতে টিউলিপকে ছেড়ে দেয়া মানেই তাকে পিকেরিঙের হাতে তুলে দেয়া।

আরও একটা ব্যাপার রানার পক্ষে এড়ানো সম্ভব নয়। টিউলিপের প্রতি দায়িত্ব। নিষ্পাপ মেয়েটা তো কোন দোষ করেনি। প্রেসিডেন্টের মেয়ে বলে নয়, টিউলিপ কোন মেথরের মেয়ে হলেও তার প্রতি এই দায়িত্ব পালন করত রানা। কোন

অবস্থাতেই তাকে পিকেরিঙের হাতে তুলে দিত না।

হ্যাঁ, বদলে গেছে অ্যাসাইনমেন্ট। এটা আরও কঠিন। শত্রুর কাছ থেকে পালানো চলবে না, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে সরাসরি হোয়াইট হাউসে ঢুকতে হবে ওকে।

রানার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। বেশি সাহস দেখানো হয়ে যাবে? স্বেচ্ছায়, বোকার মত, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে ও?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চিন্তাগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল রানা। প্রকাণ্ড ঝুঁকি, তা ঠিক। কিন্তু পুরস্কারও তো বিরাট। পিকেরিংকে পরাজিত করতে পারলে একটা অন্যায়ের অবসান ঘটবে। টিউলিপকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দিতে পারলে অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সাফল্য এলে উল্লাসের সাথে আসবে আত্মতৃি।

বাধা আর বিঘ্ন যাই থাক, টিউলিপকে বাড়ি নিয়ে যাবে রানা।

তারপর হেঁটে বেরিয়ে আসবে।

তারপর মাসুদ রানার কোন অস্তিত্ব না থাকে নাই থাকবে। মাসুদ রানা না থাকলে কাকে শাস্তি দেবে মার্কিন প্রশাসন? কাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাবে? কিংবা কার স্বাধীনতা কেড়ে নেবে?

হাওয়া হয়ে যাবে সে বেমালুম।

আট

লাইনের সবাই মেয়েটার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। গ্রীক মেয়েরা সুন্দরী এবং লম্বা-চওড়া হয় বটে, কিন্তু দুটোর এমন মহামিলন সহজে চোখে পড়ে না। শুধু পুরুষরা নয়, মেয়েরাও তাকিয়ে থাকল—তবে সম্ভবত মেয়েরাই শুধু ঈর্ষা বোধ করল।

প্যান অ্যামের টিকেট এজেন্ট তো মেয়েটাকে দেখে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়ল। দশ সেকেণ্ড হাঁ করে থাকল সে, আশপাশে মশা-মাছি থাকলে নির্ঘাত দু'একটা ঢুকে পড়ত। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে গদ গদ ভঙ্গিতে বলল, 'ইয়েস, ম্যাডাম?' ঘন ঘন হাত কচলাল সে। 'বলুন আপনার কি খেদমতে লাগতে পারি?'

মেয়েটা তার পার্স যত্ন করে রাখল কাউন্টারের কিনারায়, দস্তানা পরা হাত দুটো ভাঁজ করল বুকের কাছে, মাথা একদিকে একটু কাত করে মিষ্টি হেসে তাকাল লোকটার দিকে। সে জানে সে সুন্দরী। পরনে হাতে সেলাই করা এক রাঙা স্যুট—শরীরের যে গড়ন তাতে খোলামেলা থাকার বা সূç পোশাক পরার কুমতি না থাকারই কথা। কণ্ঠস্বর গভীর, তবে কোমল এবং সুরেলা।

ভাষাটা, বলাই বাহুল্য, গ্রীক।

'ইণ্টারন্যাশনাল প্লেসমেণ্ট সোসাইটির সেক্রেটারি আমি,' বলল মেয়েটা। 'সোফিয়া ডালিক্লিয়স। এতিম একটা শিশুকে লণ্ডনে পাঠাতে চাই।'

দ্রুত মাথা কাত করল টিকেট এজেন্ট, 'শিশুটি কি একা যাবে, ম্যাডাম?'

মেয়েটা হাসল। দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝকে। 'হ্যাঁ। ওর্কশায়ারে এক পরিবার তার দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এই মুহূর্তে এমন কেউ নেই যাকে ওর সাথে পাঠানো যায়। তবে হিথ্রো এয়ারপোর্টে আমাদের প্রতিনিধি থাকবে, সে-ই ওর দায়িত্ব নেবে।'

একটা ফর্ম বের করল লোকটা। 'শিশুর বয়স, ম্যাডাম?'

'চার।'

মুখ তুলে তাকাল লোকটা। ইতস্তত করতে লাগল সে, 'আপনি নিশ্চয়ই বোঝেন, ম্যাডাম, ফ্লাইটের শেষ মাথায় আমরা ওর দায়িত্ব নিতে পারব না।'

'হ্যাঁ, জানি—বললামই তো, ওখানে আমাদের লোক থাকবে।'

আবার মাথা কাত করল লোকটা। 'কবে তাকে পাঠাতে চান আপনি, ম্যাডাম?'

'যদি সম্ভব হয় কালই।'

কাউন্টারে রাখা কমপিউটর সেটটা চেক করল এজেন্ট। তারপর মুখ তুলে মেয়েটার দিকে তাকাল। 'কাল সকাল দশটায় একটা ফ্লাইট আছে, সীটও আছে মাত্র একটা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' মিষ্টি হাসল মেয়েটা। পার্স তুলে নগদ টাকা বের করল সে। টিকেটের দাম মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। উপস্থিত সবাই ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার চলে যাওয়া।

এথেন্স বন্দর, পিরিয়াস। ওশেনিয়া লাইনস-এর যাত্রীবাহী জাহাজগুলো শুধু বসফরাস নয়, দ্বীপগুলোতেও নিয়মিত আসা-যাওয়া করে।

টিকেট এজেন্ট সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল, 'যতটুকু পারি আপনার জন্যে করব আমরা, ম্যাডাম সসেলা। বলুন তো, ক'টা রিজার্ভেশন দরকার আপনার?'

'সাতাশ জন মানুষ, আর ষোলোটা জানোয়ার,' স্মিত হেসে বলল মেয়েটা।

ঝট্ করে মুখ তুলল লোকটা, বিস্মিত হয়েছে। 'জানোয়ার?'

'আমরা সার্কাস পার্টি, মিস্টার,' মেয়েটা সগর্বে জবাব দিল।

'ও, আচ্ছা, বুঝলাম...।'

দস্তানা পরা একটা হাত তুলে আশ্বস্ত করল মেয়েটা। 'হিংস্রগুলো খাঁচায় থাকবে, বুঝতেই পারছেন। বাকি সব ক'টা পোষ মানানো। স্বভাবতই আমরা চাইব কার্গো হিসেবে দেখা হবে ওগুলোকে। আর হ্যাঁ, সাথে ট্রেনার থাকছে। আপনাদের চিন্তার

কোন কারণই নেই… ।’

‘ভেরি গুড।’ লোকটা খুঁটিয়ে দেখল–সার্কাসের মেয়ে, তাই তো বলি! এরকম সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী মেয়ে থাকায় সার্কাসের মালিক নিশ্চয়ই দু’হাতে টাকা কামাচ্ছে। সন্দেহ নেই, মোটা টাকা অ্যাডভান্স পেয়ে ইস্তাম্বুলে যাচ্ছে পার্টি। জিজ্ঞেস করল, ‘কোয়ারানটাইন পেপারস ঠিকঠাক আছে তো, ম্যাডাম?’

‘দু’মাস আগে সুইজারল্যাণ্ড ছাড়ার পর আটটা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়েছি আমরা,’ বলল মেয়েটা। ‘কোয়ারানটাইন পেপারস ঠিক থাকবে না মানে?’

‘কবে আপনারা যেতে চান?’

‘যদি সম্ভব হয় কালই।’

‘কাল? সাতাশজন লোক, ষোলোটা জানোয়ার, আর আপনি কিনা বলছেন কালই যেতে চান?’

ভুবনভোলানো হাসি দেখা গেল মেয়েটার কমলাকোয়া ঠোঁটে। ‘শিডিউল, মিস্টার, শিডিউল। দিন তারিখ ঠিক রাখতে পারি বলেই আমাদের পার্টির এত সুনাম।’

সুন্দর অবয়বের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। ‘ঠি-ই-ক আ-ছে। দেখি কি করা যায়।’ খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করল সে। ‘আরও একটা ব্যাপার। চেক বা অন্য কিছু নেব না কিন্তু আমরা। ভাড়া আপনাকে নগদ মেটাতে হবে।’

‘আমি তৈরি হয়েই এসেছি,’ বলে পার্সটা চওড়া কোলের ওপর থেকে তুলে খুলল মেয়েটা। ‘হিসেব করে বলুন, কত দিতে হবে। সবার জন্যেই ডেক প্যাসেজ বুক করব আমি, শুধু একজনের জন্যে একটা কেবিন দরকার হবে। বড় কেবিন, মানে ডাবল। দু’জন ধরা যায় না, তবু দু’জনের জন্যে বড় একটা কেবিনই দরকার। একটা বাচ্চা আর তার বাবা।’

ছোটখাট একটা চার্টার এয়ারলাইন। নাম, গ্লাইফাদা। ডেস্কের পিছনে বসা প্রৌঢ় মহিলা মেয়েটাকে ঢুকতে দেখেই নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিঃশ্বাস আটকে গেছে তার। কোন মেয়ে এত সুন্দরীও হয়! 'ইয়েস, ম্যাডাম?'

নরম সুরে কথা বলল মেয়েটা। অভিজাত ঘরের সুন্দরী বউ, অথচ এতটুকু গর্ব বা দেমাক নেই। 'আমার ছেলে,' ঠোঁটে বিষণ্ন হাসি নিয়ে বলল সে। 'দেখুন না কি ভাগ্য, এখানে বেড়াতে এসে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসেছে। এখন মোটামুটি সুস্থ, হাসপাতাল থেকে ওরা বলে দিয়েছে বাড়ি ফিরতে পারবে। এখন দেখুন আপনারা আমাদের অর্লিয়ান্সে নিয়ে যেতে পারেন কিনা।'

'কেন পারব না!' মিষ্টি হাসল প্রৌঢ়া। 'কবে যেতে চান আপনারা?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বলল মেয়েটা। 'যদি সম্ভব হয় কালই। আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকতে চাই না।'

এথেন্সের সবগুলো এয়ারপোর্ট আর বন্দরে অ্যাডভান্স রিজার্ভেশন চেক করছে গ্রীক ইন্টেলিজেন্স। শুধু এয়ারপোর্টেই বারোজন এজেন্টকে লাগানো হয়েছে, কমপিউটর লিস্ট পরীক্ষা করে দেখবে তারা, বয়স এবং বর্ণনা মেলে এমন কোন বাচ্চার জন্যে সীট রিজার্ভ করা হয়ে থাকলে তদন্ত চালাবে। একঘেয়ে, কঠিন কাজ—তালিকায় চোখ বুলাও আর টিক চিহ্ন দিয়ে বাতিল করো। শয়ে শয়ে নাম পড়া হলো, তদন্তও হলো কয়েকটা কেস, কিন্তু বর্ণনার সাথে কোন বাচ্চাকেই মেলানো গেল না।

তবে একজন এজেন্টের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সে তার তালিকার পরবর্তী নামটা দেখল। বহুগুণ বেড়ে গেল আগ্রহ। স্তূপ করা ডুপ্লিকেট টিকেট ফর্মগুলো নিল সে, পেয়ে গেল রিজার্ভেশনের সাথে যেটা মেলে। দ্রুত হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলল

সে। অপরপ্রান্ত থেকে উত্তর দিল এক মহিলা কণ্ঠ, 'ইন্টারন্যাশনাল প্লেসমেন্ট সোসাইটি।'

'ম্যাডাম সোফিয়া ডালিক্লিয়স, প্লীজ।'

'দুঃখিত, তিনি এখানে নেই।'

'কবে ফিরবেন?'

'এক হ—ার আগে নয়।'

'এক হ—া...।'

'ম্যাডাম সোফিয়া দেশের বাইরে গেছেন, দশ দিনের ট্যুরে, তিন দিন আগে।'

এজেন্ট লোকটা জরুরী ভঙ্গিতে কামরার আরেক দিকে বসা অফিসারের উদ্দেশে হাতছানি দিল। 'আপনি ঠিক জানেন তো?' ফোনে জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি না মানে? আপনাকে আর কেউ সাহায্য করতে পারে?'

'ধন্যবাদ, ম্যাডাম, যথেষ্ট সাহায্য আপনি ইতিমধ্যেই করেছেন,' বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল এজেন্ট।

ক্যাপটেন ডেভিড কপার প্রসঙ্গ জেভ রিকার্ডের কানে এল ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে।

ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্সকে আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, অস্বাভাবিক কোথাও কিছু ঘটলে সাথে সাথে তা রিপোর্ট করতে হবে। ডেভিড কপার কিছুদিন আগে পর্যন্ত সি.আই.এ. অপারেটর ছিল, ড্রাগের সাহায্যে ঘুম পাড়ানো অবস্থায় পাওয়া গেল তাকে, ঘটনাটাকে স্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নেই। তাছাড়া ক্যাপটেনের পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, এবং অতিরিক্ত একটা ইউনিফর্মও খোয়া গেছে।

ইতোমধ্যে সি.আই.এ. কমপিউটর সেকশন থেকে রানার ফাইল পৌঁছে গেছে জেফ রিকার্ডের হাতে। সেটা খুলে নাড়াচাড়া

করতেই জানা গেল, মাসুদ রানার বন্ধুদের মধ্যে ডেভিড কপার একজন। ডিফেন্সের ইন্টেলিজেন্সের রিপোর্ট পাবার সাথে সাথে প্রেসিডেন্টের স্টাডিরূম থেকে এথেন্সে ফোন করলেন তিনি, গ্রীক ইন্টেলিজেন্স চীফের সাথে কথা বলে বুঝলেন, ডি.আই. ঘটনাটা তাকে অনেক দেরি করে জানিয়েছে।

'ক্যাপটেন ডেভিড কপার এখনও এখানে অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছেন,' গ্রীক চীফ বললেন। 'অথচ আজ সকালে তিনি এথেন্সের উদ্দেশে হেরাক্লিয়ন ত্যাগ করেছেন অলিম্পিক ফ্লাইটে।'

হতাশ হলেন জেফ রিকার্ড, সেই সাথে প্রভাবিতও হলেন। 'আপনি ঠিক জানেন, এ-ও সেই একই ডেভিড কপার?'

'যদি না আপনাদের একই নাম, একই পাসপোর্টে, একই চেহারায় দু'জন এয়ারফোর্স ক্যাপটেন থাকেন।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন জেফ রিকার্ড। রানা যে, তাতে কোন সন্দেহই নেই। কপারকে অনেক দিন থেকে চেনে রানা, তার চেহারা নেয়া কঠিন কিছু নয়, বিশেষ করে রানার ডোশিয়েতে বলা হয়েছে ছদ্মবেশে পটু সে। তাছাড়া, এ-ধরনের কৌশল অবল'ন করা রানার একটা বৈশিষ্ট্যও বটে। অপরপক্ষকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এথেন্সে রানার গন্ধ খুঁজে বের করা সম্ভব বলে মনে করেন?'

গ্রীক ইন্টেলিজেন্স চীফ নির্ভেজাল আত্মতৃ"ির হাসি হাসলেন। 'আপনি যা আশা করছেন, আমরা তার চেয়ে একটু বেশি এগিয়ে আছি, মি. রিকার্ড।'

'আচ্ছা,' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন সি.আই.এ. চীফ। 'কি রকম?'

'আমাদের বিশ্বাস করার কারণ ঘটেছে, আপনার মাসুদ রানা গ্রীস ছাড়ার চেষ্টা করছেন। কিভাবে তাঁকে আটকাতে হবে আমরা জানি।'

বাকশক্তি হারিয়ে জেফ রিকার্ড অপেক্ষা করছেন।

'তিনজন মেয়ে,' গ্রীক চীফ বললেন। 'তিনটে নাম এবং জাতীয়তা, কিন্তু চেহারার বর্ণনা হুবহু এক।'

বাকিটুকুও নিঃশব্দে শুনে গেলেন জেফ রিকার্ড। তিনটে মেয়ে, প্রত্যেকে একটা বাচ্চাকে সাথে নিয়ে বা সাথে না নিয়ে এথেন্স ত্যাগ করতে চায়। গ্রীক, সুইস, আর ফ্রেঞ্চ। তিনজনই ভুয়া। ম্যাডাম সোফিয়া দেশের বাইরে। ম্যাডাম সসেলার সার্কাস পার্টি ন'মাসের জন্যে তাঁবু গুটিয়ে ফেলেছে। আর অ্যাটিক পেনিনসুলার কোন হাসপাতালে চার বছর বয়সের কোন বাচ্চাকে ভর্তিই করা হয়নি। তারমানে ম্যাডাম অলিভাও মিথ্যে কথা বলেছে।

তিনটে মেয়ে, চোখে ধুলো দেয়ার তিনটে প্রয়াস।

শুধু কি এই তিনটেই? জেফ রিকার্ড ভাবলেন। নাকি আরও আছে?

পরস্পর বিরোধী ভাবাবেগে আক্রান্ত হলেন তিনি। রাগ হলো, আবার মুগ্ধও হলেন, সবচেয়ে বেশি অসহায় বোধ করলেন। শুনতেই রানার মত লাগছে। প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, রানাই। কিন্তু জেফ রিকার্ড জানেন, মেয়ে তিনটেকে ধরা যাবে না, গেলেও তারা কেউ রানা হবে না–না এথেন্সে, না লণ্ডনে, বা পিরিয়াসে, গ্লাইফাদায়, বা অর্লিয়াসে।

একটাই কারণ–তিনটে মেয়েকেই পানির মত সহজে খুঁজে পাওয়া সম্ভব, রানাও সেটা জানে।

ফোন ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিলেন জেফ রিকার্ড। রানাকে নিয়ে ভাবছেন। ডাইভারশন তৈরি করা রানার স্টাইল। যুক্তিগ্রাহ্য পথে যাওয়াটা নয়। সহজেই ট্রেস করা যায় এ-ধরনের তিনটে ডাইভারশন কেন সে তৈরি করতে গেল? নিশ্চয়ই পালাবার অন্য কোন প্যা ঠিক করে রেখেছে সে,

ডাইভারশনগুলোর একটাও তার ব্যবহার করার দরকার পড়বে না।

জেফ রিকার্ড একজন প্রফেশনাল, রানার ফাইল মুখস্থ করে ফেলেছেন তিনি। রানার অতীত অ্যাসাইনমেন্টগুলো সম্পর্কে জানেন। জানেন রানা কি ধরনের টেকনিক ব্যবহার করে। তার মন-মানসিকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা জন্মেছে। সবশেষে তিনি একটা উপসংহারে পৌঁছুলেন—আমেরিকার সাথে রানা বেঈমানী করবে না। অন্তত এই অ্যাসাইনমেন্টে রাশিয়ার স্বার্থ রক্ষা করবে না সে।

কিন্তু তবু এ-কথা সত্যি যে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে কিডন্যাপ করেছে রানা। সম্ভবত খুনও করেছে দু'একটা। তবে এ-ও ঠিক যে পিকেরিং যে বিশ্বাসঘাতক তা তার জানার কথা নয়। রানা জানত পিকেরিং সি.আই.এ-র পক্ষ নিয়েই কাজ করছে।

নাকি জানত না?

নতুন একটা চিন্তা ঢুকল মাথায়। কপালে রেখা ফুটল। নসোসে পিকেরিঙের সাথে ছিল রানা। সম্ভবত প্ল্যান করে পরস্পরের সাথে দেখা করতে যায় ওরা। প্রথম পুলিসকে খুন করার সময় পিকেরিং রানার নাম ধরে জোরে একবার চিৎকার করে উঠেছিল। রাগে? সে হয়তো ভেবেছিল পুলিস লোকটা রানা। তবে কি রানাকেই সে খুন করতে চেয়েছিল?

রানা কি ব্যাপারটা টের পেয়ে যায়? পিকেরিঙের দল ত্যাগ করে সে? নসোসেই ওদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে?

ধারণাটা দৃঢ় হতে শুরু করল জেফ রিকার্ডের মনে, সেই সাথে তাঁর মুখে হাসি দেখা গেল। নিঃসঙ্গ রানা, বি.সি.আই. কিংবা নিজস্ব এজেন্সির সাহায্য চাইতে পারছে না, কারণ জানে জেফ রিকার্ডের লোকজন হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই। যা যুক্তিগ্রাহ্য, এই একবার অন্তত, তা করতে পারে রানা। আর তো কোন পথ

খোলা নেই তার সামনে। তিনটে মেয়েরই একটা করে চার বছরের বাচ্চা আছে। রানা যদি পিকেরিংকে ত্যাগ করে থাকে, তাহলে টিউলিপ নিশ্চয়ই রানার কাছেই আছে।

এটা নিঃসন্দেহে একটা সুসংবাদ, কারণ প্রাণ থাকতে টিউলিপের কোন ক্ষতি হতে দেবে না রানা।

সময়ের সাথে সাথে গোটা ব্যাপারটা জটিল থেকে জটিলতর রূপ নিচ্ছে। তাঁর আক্রোশ মেটাবার জন্যে পিকেরিংকে চাই, কিন্তু আরও বেশি দরকার রানাকে। কারণ রানার কাছে টিউলিপ রয়েছে। তবু সাবধান হবার প্রয়োজন আছে। এমন কিছু করা চলবে না যাতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে রানা। বিকল্প পথ না পেলে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিতে বাধ্য হবে সে, আর রানার ঝুঁকি নেয়া মানে টিউলিপের বিপদের মধ্যে পড়া।

তারপর আরেকটা চিন্তা মাথায় ঢুকল, নিভে গেল মুখের হাসি। রানা যদি পিকেরিংকে ত্যাগ করে থাকে, তাহলে পিকেরিং নিশ্চয়ই রানাকে গরু খোঁজা করছে–তার মতই। ব্যাপারটা তাহলে ধাওয়া নয়, প্রতিযোগিতা। গতিই এখন মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। শুধু যে রানাকে পেতে হবে তাই নয়, পেতে হবে পিকেরিঙের আগে।

অথচ লাখ লাখ মানুষের মধ্যে যে-কেউ রানা হতে পারে!

হতাশায় প্রায় মুষড়ে পড়লেন জেফ রিকার্ড। ক্লান্তি এবং ভয় তাঁকে গ্রাস করতে চাইল। এর শেষ কোথায়? কিভাবে শেষ হবে? শেষের পর অবশেষ, কি হবে তার চেহারা? পিকেরিঙের বিশ্বাসঘাতকতা আর কি কি সর্বনাশ ঘটাতে পারে? আর কতজন এজেন্টকে মারবে সে? তার সাথে আর কারা আছে? সি.আই.এ-র কোন্ লোকটা এখনও বিশ্বস্ত?

আর যাই হোক, রানা অন্তত সি.আই.এ. এজেন্ট নয়। এখন বোঝা যাচ্ছে, পিকেরিঙের লোকও নয় সে।

অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো জেফ রিকার্ডের। রানার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ করলেন তিনি।

কারণটাও তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। রানা বুদ্ধিমান, সে নীচ নয়, তার একটা কোমল হৃদয় আছে—সেজন্যেই এই কৃতজ্ঞতাবোধ। কৌশলজ্ঞানের কারণেই জেফ রিকার্ডের হাতে ধরা পড়বে না রানা, সেই একই কারণে পিকেরিং বা রাশিয়ানদের হাতেও ধরা পড়বে না সে।

কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন তিনি। উপলব্ধি করলেন, রানার ওপর তিনি নির্ভর করতে শুরু করেছেন। কিন্তু কেন? এখন কি করবে রানা? প্রশ্নের উত্তর ওই অদ্ভুত মানুষটার মতই অজ্ঞাত আর রহস্যময়।

তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে টিউলিপ রানার হাতে রয়েছে, ভাবলেন জেফ রিকার্ড। আর কেউ হলে এত সব বিরুদ্ধ শক্তির সামনে বারো ঘণ্টাও টিকতে পারত না।

যথারীতি নির্দিষ্ট সময়ে জেনোফন গ্যালারি থেকে বেরিয়ে এল কেলী। বাসে চড়ে বাড়ি ফিরল সে, রোজই তাই ফেরে। পথে একটা মার্কেটে থামল, রুটি আর মাখন কিনল, সিগারেট কিনল এক প্যাকেট। কাউন্টারে বসা তরুণ ছেলেটির সাথে রসিকতা করল। আড়ষ্ট কোন ভাব নেই, মনটা প্রফুল্ল।

বাড়ি ফিরে গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে গিয়েও ঢালল না, বদলে কফি তৈরি করল। ভাবল, নার্ভ ভোঁতা করার সময় নয় এটা। পিকেরিঙের সাথে কথা বলা দরকার।

কিন্তু যোগাযোগ করার উপায় নেই। পিকেরিং যোগাযোগ করবে এই অপেক্ষায় আছে সে।

অবশেষে টেলিফোন বাজল।

'হ্যালো?'

'ডিকসন আছে নাকি?'

কেলীর চেহারায় পরম স্বস্তি ফুটে উঠল। কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল সে, 'রঙ নাম্বার।'

'দুঃখিত।'

'নো ট্রাবল।'

অপরপ্রান্ত থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো। ছোঁ দিয়ে পার্সটা তুলে নিয়ে হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল কেলী। দশ মিনিট পর একটা ফোন বুদের ভেতর দেখা গেল তাকে। বেল বাজতেই রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল।

হ্যাঁ, পিকেরিংই।

'বাঁচলাম!'

'কেন, কি হয়েছে?' পিকেরিং জিজ্ঞেস করল।

'ডেভিড কপারকে মনে আছে আপনার?'

'অবশ্যই। কেন?'

'আজ সে হঠাৎ গ্যালারিতে এসে গোলাপ কুঁড়ি সম্পর্কে কথা বলছিল।'

একেবারে থ হয়ে গেল পিকেরিং। 'বলো কি!'

'জ্বি হ্যাঁ,' বলল কেলী। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে। 'কি বলব, মানে, কেমন যেন লাগল। একবার মনে হলো লোকটা বোধহয় কপার নয়।'

অপরপ্রান্তে পিকেরিং কথা বলছে না।

'আমার ভুলও হতে পারে,' আবার বলল কেলী। 'দেখতে সে হুবহু কপারের মত, কথার ভঙ্গি, নড়াচড়া—সব কিছু তারই মত। কিন্তু সে চলে যাবার পর একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম।'

পিকেরিঙের নিঃশ্বাস পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। অপরপ্রান্তে কেউ আছে বলে মনে হয় না।

'গোলাপ ফুলে অ্যালার্জি আছে কপারের,' বলল কেলী।

'আমার ডেস্কে অনেকগুলোই ছিল। অথচ তার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি।'

হিম কণ্ঠে পিকেরিং বলল, 'যা যা বলেছে সব রিপিট করো।'

চোখ বুজে কপারের অফিসে ঢোকার মুহূর্তটা স্মরণ করল কেলী। এক এক করে সব বলল সে, কিছুই বাদ দিল না। এয়ারফোর্স প্রসঙ্গ। চশমা আর ইউরিপিডিস। ইন্টেলিজেন্স কাজকর্ম, আর টিউলিপ। পল রিজওয়ে।

তার কথা শেষ হতে পিকেরিং একটা মাত্র প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবে তার কোন আভাস পেয়েছ?'

'না,' বলল কেলী। 'তবে ভুয়া বলে যখন সন্দেহ হলো, কয়েক জায়গায় ফোন করে দেখলাম কিছু জানা যায় কিনা। এথেন্সের হোটেল অ্যামব্যাসাডরে ডেভিড কপার নামে এক লোক একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে।'

সময় দিতে রাজি হয়েছে মস্কো। বারোজন কে.জি.বি. এজেন্টের ওপর হেরাক্লিয়নের দায়িত্ব দিয়ে সারটভকে নিয়ে এথেন্সে ফিরে এসেছে পিকেরিং, শিডিউল-বিহীন একটা প্লেনে চড়ে। তার মন গাইছিল, রানাও এখানে আসবে—এথেন্স বড় শহর, সব সময় ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগে আছে, গা ঢাকা দেয়া যেমন সহজ, তেমনি প্রয়োজনে পালাবার রাস্তা আছে অনেকগুলো। প্রমাণ হয়ে গেল, ঠিকই আন্দাজ করেছিল সে।

এথেন্সে নেমে সরাসরি কোলোনাকি স্কয়ারে চলে আসে পিকেরিং। এখানে একজন সোভিয়েত কূটনীতিকের বাড়ি আছে। সাময়িক ছুটি নিয়ে মস্কোয় গেছে সে, তার ফোনটা সম্পূর্ণ নিরাপদ—হতেই হবে, কারণ কূটনীতিক লোকটা আসলে লোকাল কে.জি.বি. রেসিডেন্ট।

ফোনটা পিকেরিং ব্যবহার করল সি.আই.এ-র ভেতর তার

নিজের লোকদের সাথে যোগাযোগ করার কাজে। দূতাবাসে আছে তিনজন, লোকাল স্টেশনে একজন। কেলীর সাথে যোগাযোগ করায় পয়সা উসুল হয়ে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সারটভের দিকে ফিরল সে। 'হোটেল অ্যামব্যাসাডরে উঠেছে রানা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সারটভ। ঝড়ের বেগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল দু'জন। গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে ছুটল। বিশ মিনিট পর রানার ঘরের সামনে দেখা গেল ওদেরকে। দরজার নিচ দিয়ে সরু এক ফালি আলো বেরিয়ে আসছে নির্জন করিডরে। মৃদু শব্দে একটা রেডিও বাজছে ভেতরে।

পিকেরিংকে পিস্তল বের করতে দেখে পিছিয়ে গেল সারটভ। দূরে সরে গিয়ে একটা কাঁধ নিচু করল সে, তারপর সবেগে ছুটে এসে দরজায় কাঁধ দিয়ে পড়ল। দড়াম করে খুলে গেল কবাট। এমন কি তালা পর্যন্ত দেয়া ছিল না।

না থাকারই কথা।

কুঁজো হয়ে পিস্তল ধরা হাতটা তুলল পিকেরিং। পরমুহূর্তে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল খালি কামরার দিকে। ডেভিড কপার কামরায় ছিল বটে, এখন শুধু তার ইউনিফর্মটা রয়েছে ক্লজিটে। ওটা ফেলে রেখে গেছে মাসুদ রানা। যাবার সময় সাথে করে নিয়ে গেছে প্রেসিডেন্টের মেয়েকে।

শহর থেকে বেরুবার মুখে ফুটপাথের পাশে একটা মেইল বক্সের সামনে থামল রানা। বক্সের ভেতর একটা প্যাকেট রাখল ও। ভেতরে কপারের পাসপোর্ট আর মানিব্যাগ আছে, আর আছে নগদ পাঁচ হাজার ডলার। ছোট্ট একটা চিরকুটও আছে, কপার জানতে পারবে কোথায় পার্ক করা আছে তার সাদা ফিয়াট।

উপকারী বন্ধুর জন্যে এটুকু না করলে কেমন দেখায়, ভাবল

রানা।

নয়

মোলাঞ্জা রমিউলাসের সামনে চীনা মাটির প্রকাণ্ড একটা ধূমায়িত গামলা, পাশেই একটা রুপোর থালা। গামলাটা মশলাদার চর্বি আর মাংসে টইটু'র, থালায় ঘরে তৈরি রুটির পাহাড়। নিউ ইয়র্ক থেকে আসা লোকটার দিকে তাকিয়ে থেকেই আবার মস্ত হাঁ করল সে, ভেতরে চালান হয়ে গেল কয়েক টুকরো লালচে মাংসের সাথে গোটা একটা রুটি। 'কলম্বিয়ান শিপমেন্টের খবর কি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ওগুলোর তো দারুণ চাহিদা হওয়ার কথা।'

'তা হওয়ার কথা,' লোকটা বলল। 'কিন্তু কিছু ডিস্ট্রিবিউটর তাদের মেক্সিকান মাল কলম্বিয়ান বলে চালাবার চেষ্টা করছে। কাজেই সমস্ত মালকেই সন্দেহের চোখে দেখছে সবাই। এই ঝামেলাটা না মেটা পর্যন্ত কেউ কিছু কিনবে না।'

'কোন্ ডিস্ট্রিবিউটর?'

'ইটালিয়ান।'

'হুঁ।' ছোট, চোঙ আকৃতির মাথাটা নাড়ল মোলাঞ্জা রমিউলাস। গ্লাস ভর্তি ওয়াইন এক চুমুকে শেষ করে আবার ভরে দেয়ার ইঙ্গিত করল।

'এখন আপনি যা ঠিক করেন, স্যার,' বলল লোকটা।

ছোটখাট রমিউলাস ভরা ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল। 'হ্যাঁ।' টেরেসের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল সে। তার এই বাড়ি, বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই উচিত, ডেলফি গ্রাম থেকে

অনেক ওপরে পারনাসাস পাহাড়ের ঢালে তৈরি করা হয়েছে। টেরেস থেকে নিচে তাকালে গ্রাম ছাড়িয়ে আরও বহুদূর দৃষ্টি চলে, অ্যাপোলোর মন্দির দেখা যায়, চাঁদের আলোয় কেমন যেন ভৌতিক আর রোমাঞ্চকর মনে হয়। একটু দূরে ছোট কিন্তু আরও প্রশান্ত অ্যাথেন প্রোথেন মন্দির। তারপর, পাহাড়ের পাদদেশ ঘিরে থাকা সবুজ জলপাই ঝোপ। তারপর উপসাগর, উপসাগরের ওপারে প্যাট্রাস-এর আলো।

তার পিছনে চাঁদের আলো মাখা আকাশের গায়ে প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে পাহাড়। এই চূড়া থেকেই তো অ্যাপোলো এক সময় পারসিয়ান সেনাবাহিনীকে পাথর ছুঁড়ে থামিয়ে দিয়েছিলেন। সেই একই চূড়ায় বসে অবৈধ ব্যবসার বিশাল জাল তৈরি করেছে মোলাঞ্জা রমিউলাস প্রায় গোটা পৃথিবী জুড়ে।

মারিজুয়ানার খেতে মেক্সিকো সরকার যতদিন খুশি বিষ স্প্রে করুক, তার কিছু করার নেই ওখানে। ইটালিয়ানরা মেক্সিকোর বিষাক্ত মারিজুয়ানা কলম্বিয়ান বলে চালাবার চেষ্টা করছে করুক। সব রসাতলে যাচ্ছে এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। তার সঙ্গতি আছে, কাজেই উদ্বিগ্ন হওয়ার দরকার কি?

ছোট ছোট চুমুক দিয়ে গ্লাসটা শেষ করল রমিউলাস। তারপর নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধির দিকে ফিরল। 'মাল সব গুদামজাত করো,' বলল সে। 'মউজুদ ভাল ব্যবসা। আগামী বছর এই মাল দ্বিগুণ দামে বিক্রি হবে।' একজন চাকর ভেতরে ঢুকতে মুখ তুলে তাকাল সে।

'একজন ভিজিটর, স্যার। আপনার সাথে দেখা করতে চাইছেন।'

চোঙ আকৃতির মুখ বিকৃত হয়ে উঠল রমিউলাসের, যেন ভেংচাল। 'কারও সাথে আমি এখন দেখা করব না।'

'উনি একজন প্রিস্ট। সামনের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে

আছেন।'

'প্রিস্ট হোক বা আর্চবিশপ হোক, বিদায় করো!'

কিন্তু চাকর নড়ল না। 'আপনাকে উনি বলতে বললেন, তাঁর নাম ফাদার মলিউস—আপনাকে নাকি পাঁচ বছর আগে চিনতেন।'

জমাট পাথর হয়ে গেল মোলাঞ্জো রমিউলাস। তার চেহারায় একাধারে রাগ এবং ভীতির ছাপ ফুটে উঠল। স্থির দাঁড়িয়ে থাকল সে। ধীরে ধীরে চোখ জোড়া ছোট হয়ে এল।

ফাদার মলিউস! মাই গড, ফাদার মলিউস? আবার কি চায় ওরা?

নিঃশব্দে ইঙ্গিত করল রমিউলাস, নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি বিদায় নিয়ে চলে গেল।

চাকরের দিকে ফিরল রমিউলাস। ছোটখাট একটা দৈত্যই বলা যায় লোকটাকে, সাদা জ্যাকেটের তলায় হোলস্টারে রিভলভার আছে। তাকে কাছে ডেকে নিচু গলায় বলল রমিউলাস, 'ভালমানুষ ফাদারকে বোলো তিনি দয়া করে আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। যাও, তাঁকে সম্মানের সাথে নিয়ে এসো। কিন্তু তারপর কাছেপিঠেই থেকো।'

প্রজেক্ট মলিউস—সি.আই.এ-র সহজ একটা অপারেশন ছিল। লৌহ-যবনিকার অন্তরালে, একজন লোককে প্যারাস্যুট যোগে নামানো। জায়গাটার নাম ক্যারেলিয়া পেনিনসুলা, ওখানে রাশিয়ানদের বেশ কয়েকটা টপ-সিক্রেট ডিফেন্স সিস্টেম রয়েছে।

লোকটাকে পাঠানো হবে, কিন্তু সে ধরা পড়লে সি.আই.এ-র সাথে তার সম্পর্ক আছে এটা প্রকাশ পাওয়া চলবে না—এই ছিল সমস্যা। সমাধানের দায়িত্ব চাপানো হয় মোলাঞ্জো রমিউলাসের ওপর। সে তার ব্যক্তিগত বিশাল বিমান বহর থেকে একটা বিমান ব্যবহার করতে দেয়। অবশ্যই স্বেচ্ছায় নয়।

তার বিরুদ্ধে প্রমাণ ছিল সি.আই.এ-র হাতে। মৌখিক প্রমাণ

নয়, সই করা কাগজ-পত্র, ফটো, ইত্যাদি। যা ফাঁস হয়ে গেলে বাকি জীবন জেলখানায় কাটাতে হত তাকে।

সেটা পাঁচ বছর আগের ঘটনা। আর কখনও তার সাহায্য চাওয়া হবে না, ওদের এই প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেছিল সে। অথচ আবার ফিরে এসেছে।

কি মনে করে!

টেরেসে উদয় হলো ধর্মযাজক। লম্বা একহারা গড়ন, সারা মুখে কালো দাড়ি, পরনে গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্টের ঢিলেঢালা আলখাল্লা।

'ফাদার মলিউস।'

রানা মাথা ঝাঁকাল।

'আবার আপনারা কি চান আমার কাছে?'

'সেই একই জিনিস, আগে যা চেয়েছিলাম। আপনার সহযোগিতা।'

গ্রীক ব্যবসায়ী একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল, তারপর নিজে আরেকটায় বসল। চেয়ারে হেলান দিয়ে ফাদারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সে। 'আবার ক্যারেলিয়া পেনিনসুলায়?'

'না,' বলল রানা। 'এবারকার টার্গেট নিউআর্ক।'

'নিউআর্ক?' বিমূঢ় দেখাল রমিউলাসকে। তারপর মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে সশব্দে হেসে উঠল সে। 'আপনি ঠাট্টা করছেন! নিউআর্ক, নিউ জার্সি?'

'নিউআর্ক, নিউ জার্সি,' ওকে নিশ্চিত করল রানা।

'কিন্তু কেন?'

'কারণ যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার জন্যে নিউআর্ককেই নিয়মিত ব্যবহার করেন আপনি। কারণ ওখানে আপনার টাকা-খাওয়া প্রচুর অফিসার আছে যারা আপনার আসা-যাওয়া নিরাপদ করে তোলে।'

রমিউলাস হাসল। ভাবল, লোকটা বেশ গুছিয়ে কথা বলতে জানে। 'তা ঠিক,' বলল সে। 'নিউআর্কে যাওয়ার নিজস্ব রাস্তা আমার আছে।'

'আর আপনার সাথে,' বলল রানা, 'আমার যাওয়ারও একটা উপায় হতে পারে।'

'আমার সাথে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্লেনে আপনাকেও থাকতে হবে।'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল রমিউলাস। 'না, অসম্ভব। প্লেনে আমি চড়ি না।'

'জানি,' বলল রানা। 'দুর্ঘটনায় আরেকটু হলে মারা যাচ্ছিলেন, ভয়টা এখনও কাটেনি। তিন বছর–হ্যাঁ।'

'কি তিন বছর?'

'তিন বছর আপনি প্লেনে চড়েননি।'

রমিউলাস তাকিয়ে থাকল। কিছুই কি সি.আই.এ-র অজানা থাকে না?

'আপনাকে আমি ভাল একটা ফি দিতে রাজি আছি,' বলল রানা।

রমিউলাস হাসল। 'টাকা দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত বদলাবেন?'

'টাকা নয়। একটা নাম?'

রমিউলাসের চোখ সরু হয়ে উঠল।

'আপনার বিরুদ্ধে ডকুমেণ্টগুলো সি.আই.এ-র হাতে তুলে দিয়েছিল যে লোক,' বলল রানা। 'লোকটা আপনার প্রতিষ্ঠানেই ছিল–আজও আছে। তার নামটা আপনি জানতে চান না?'

রমিউলাস চোখ বুজল। গত পাঁচ বছর ধরে প্রশ্নটা কাঁটার মত বিঁধছে তার বুকে। কে সেই বেঈমান? চোখ খুলল সে। 'কে সে?'

'আপনি আমার সাথে নিউআর্কে যাবেন?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রমিউলাস। তারপর সে জিজ্ঞেস

করল, 'কবে আপনি রওনা হতে চান?'

'আজ রাতে।'

'আজ রাতে?'

'এখুনি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জেফ রিকার্ড, প্রেসিডেন্টের স্টাডিরুমে পায়চারি শুরু করলেন, আপনমনে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছেন। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে খুঁজে বের করা গেছে, তার কাছ থেকে জানা গেছে এথেন্স এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে ওমোনিয়া স্কয়ারে গিয়েছিল রানা।

ওমোনিয়া স্কয়ার? আরেকটু সামনেই তো সি.আই.এ. এথেন্স স্টেশন! ফোন করে মূল্যবান আরও কয়েকটা তথ্য পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, ওখানেই গিয়েছিল রানা। আধ ঘণ্টা পর বেরিয়ে আসে সে।

তবে এবার রানা একটা ভুল করেছে।

একটা সূত্র ফেলে গেছে ও! উত্তরটা নিশ্চয়ই আর লেখা দেরাজে আছে, কোন সন্দেহ নেই। কিছু একটা দেখতে চেয়েছিল রানা, অবশ্যই রিজওয়ের ফাইলে নয়। রিজওয়ের ফাইলের সাথে আরও অনেক ফাইল আছে, প্রত্যেকের নামের প্রথম অক্ষর আর।

ওই একই ফাইল ল্যাংলির কমপিউটর টেপেও আছে। যা-ই রানা দেখতে চেয়ে থাকুক, সারারাত লেগে গেলেও, ঠিকই তিনি খুঁজে বের করবেন সেটা।

বের করতেই হবে। রানা একবার ভুল করেছে, দ্বিতীয়বার না-ও করতে পারে।

একটু মাথা ঘামাতেই পিকেরিং বুঝল, রিজওয়ের নয়, রানা আসলে রমিউলাসের ফাইল দেখে গেছে।

রিসিভার তুলে কেলীর নাম্বারে ডায়াল করল সে। বিশ মিনিট

পর অফিস থেকে কেলী তাকে ফোন করল। হ্যাঁ, রমিউলাসের ফাইল থেকে একটা পাতা চুরি গেছে। গ্রীক ইন্টেলিজেন্সে সি.আই.এ-র লোক আছে, তার সাথে এরই মধ্যে যোগাযোগ করে কেলী জেনেছে, রমিউলাসের একটা জেট উত্তর ডলফির এয়ার স্ট্রিপ থেকে একঘণ্টাও হয়নি টেক-অফ করেছে। রমিউলাস নিজে আছে প্লেনে, সাথে দু'জন বডিগার্ড, আর একজন গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্ট।

প্লেনের গন্তব্য—নিউআর্ক, নিউ জার্সি।

টিউলিপকে উদ্ধার না করে আমেরিকায় ফিরে যাওয়া উচিত হবে না, পিকেরিং জানে। মস্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। কিন্তু রানা রমিউলাসের প্লেনে রয়েছে, তারমানে নিশ্চয়ই রানার সাথে টিউলিপও আছে?

সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল পিকেরিং। এই সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। বড় একটা প্লেন দরকার তার, বড় আর শক্তিশালী। মাঝখানে রিফুয়েলিঙের দরকার হবে না, একটানে পৌঁছে যাবে নিউআর্ক, নিউ জার্সি।

রিসিভার তুলে আবার ডায়াল করল পিকেরিং, এবার অ্যারোফ্লটের নাম্বারে। নির্দিষ্ট একজনকে চাইল সে। আপন মনে হাসছে। গোটা ব্যাপারটার সাথে প্রজেক্ট মলিউসের প্রচুর মিল আছে, তবে এবারেরটা আরও বেশি কৌতুককর। এবার রমিউলাস মাসুদ রানাকে ডেলিভারি দেবে পিকেরিঙের হাতে।

দশ

একটানা মেঘের গর্জন কানে নিয়ে হেলিকপ্টার থেকে নামলেন জেফ রিকার্ড। সিঁড়ির মাঝখানে রয়েছেন, বিদ্যুৎ চমকে উঠল, কড়কড় কড়াৎ করে বাজ পড়ল কাছে কোথাও। বিদ্যুৎ চমকের আলোয় তিনি দেখলেন, টার্মিনাল বিল্ডিঙের সামনে পার্ক করা রয়েছে আর্মি ট্রাকগুলো।

আকাশের দিকে মুখ তুললেন তিনি। ঝড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে আছে। ভাবলেন, কি ধরে নেবেন, প্রকৃতিও কি মাসুদ রানাকে সাহায্য করতে চাইছে?

নিউআর্কে নিজেই চলে এসেছেন জেফ রিকার্ড। রানা যখন প্লেন থেকে নামবে, তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে চান। টিউলিপের দায়িত্ব নেয়ার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকা দরকার তাঁর। অবশ্য প্লেনটা যদি আদৌ নামতে পারে এখানে।

টার্মিনাল থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। বাতাসে হেলান দিয়ে হেঁটে এল সে, টানা বাতাসের জন্যে রেনকোটের কিনারা এক করে বুকের কাছে ধরে আছে।

'মি. জেফ রিকার্ড?' ওদের পিছনে রানওয়ে ধরে লিফট-অফে ঢুকে যাচ্ছে একটা জাম্বো জেট, তাই চিৎকার করে কথা বলতে হলো তাকে। 'আমি এফ.এ.এ-র উইলি কিপার। জঘন্য আবহাওয়া, তাই না?'

করমর্দন করার সময় গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন জেফ

রিকার্ড। 'কি মনে হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'প্লেনটাকে কি অন্যদিকে ডাইভার্ট করতে হবে?'

আকাশটা দেখে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল উইলি কিপার। 'এখনই বলা মুশকিল। বিশ মিনিটের মধ্যে মেঘ কেটে যেতে পারে। আবার জোরাল মেঘ শুরু হলেও আশ্চর্য হব না। বোস্টনে এই মুহূর্তে প্রলয় কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছে বাতাস। গাছের ডালপালা ছাড়া আর কিছুই নড়ছে না ওখানে।'

'এখানের আবহাওয়া সম্পর্কে কি বলা হয়েছে?'

'বৃষ্টি। কিন্তু পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে আমাদের কোন ধারণা নেই। মেয়েমানুষ আর ঝড়, কার সাধ্য এদের মতিগতি বোঝে!'

উইলি কিপারকে পাশে নিয়ে হাঁটা ধরলেন জেফ রিকার্ড। টার্মিনাল ভবনের দিকে যাচ্ছেন। বোমা ফাটার আওয়াজের সাথে আবার আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ। ক্ষণস্থায়ী আলোয় জেফ রিকার্ড দেখলেন, ক্যানভাস ঢাকা আর্মি ট্রাকের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে হেলমেট পরা মাথা। ফোর্ট ডিক্স থেকে দুশো ট্রুপ নিয়ে আসা হয়েছে, অ্যাকশনের জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে তারা।

রানার সাথে যুদ্ধ করতে হবে সে-ধরনের কিছু ভাবছেন না তিনি। এয়ারপোর্টের দুর্বল জায়গাগুলোয় সশস্ত্র লোক দরকার তাঁর, তা না হলে সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টে খুঁত থেকে যাবে, সেজন্যেই ওদেরকে আনা। তাছাড়া, দক্ষ মার্কসম্যানও দরকার হতে পারে।

'ইতিমধ্যে,' দরজার কাছে পৌঁছে বলল উইলি কিপার, 'ম্যানেজারের সাথে আপনার একটু সমস্যা হতে পারে। বললেন, আবহাওয়া নিয়ে এমনিতেই তিনি বিপদের মধ্যে আছেন। বোস্টনে ল্যাণ্ড করতে না পেরে এখানে ল্যাণ্ড করেছে বেশ

কয়েকটা প্লেন—জায়গা দেয়া যাচ্ছে না। আপনার সমস্যাটাকে তিনি উটকো ঝামেলা হিসেবে দেখছেন।'

'তার কোন উপায় নেই,' জেফ রিকার্ড বললেন। 'যা বলব করতে হবে। কোথায় সে?'

'আপনার জন্যে তাঁর অফিসে অপেক্ষা করছেন।'

মালাঞ্জার চাকর সাদা জ্যাকেটের বদলে কালো স্যুট পরেছে। প্লেনের স্টারবোর্ড সাইডের জানালার দিকে ঝুঁকে বাইরে তাকাল সে। 'হ্যাঁ, আমেরিকান,' নিশ্চিতভাবে জেনে তারপর বলল সে। 'এফ-ফিফটিন।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রমিউলাস। পাশে বসা লোকটার দিকে ফিরল সে। 'আমরা এখন কি করব?'

'প্রার্থনা করলে কেমন হয়?' প্রশ্ন করে নিজের দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্ট। 'আরে, এদিকেও দেখছি রয়েছে একটা!' শব্দ করে হেসে উঠল সে। 'এসকর্টস! মাসুদ রানাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছে!'

চোখে শক্তিশালী বিনকিউলার তুলল পিকেরিং। পেভমেন্টের ওপর চোখ বুলাল সে, তারপর বিল্ডিঙের পিছন দিকে দাঁড়ানো ছয়টা ট্রাকের ওপর স্থির হলো দৃষ্টি।

কয়েক সেকেণ্ড পর সারটভের দিকে ফিরল সে, আরেক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারটভ। বিশতলা বিল্ডিংটা নিউআর্ক এয়ারপোর্ট থেকে এক মাইল দূরে, এখান থেকে এয়ারফিল্ড আর টার্মিনাল ভবন পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এখানে ওরা এসেছে নিউ ইয়র্ক হয়ে, নিয়মিত অ্যারোফ্লট ফ্লাইটের ক্রু হিসেবে ছদ্মবেশ নিয়ে।

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল পিকেরিং। জেফ রিকার্ড ওদের আগেই

পৌঁছে গেছে। সাথে সেনাবাহিনীর একটা ব্যাটালিয়ন! 'সারটভ?'

জানালার দিকে পিছন ফিরল সারটভ। 'ওখানে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার,' বলল সে। 'রিকার্ডের প্ল্যানটা কি জানতে হবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার চোখে বিনকিউলার তুলল পিকেরিং। 'ঠিক। সময় মত জানতে পারব। কিন্তু আপাতত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

জেফ রিকার্ড অফিস ঘরে ঢুকে দেখলেন জোনাথন টড গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন তাঁর চেয়ারে। তিনি দাঁড়ালেন না।

তাঁর বয়স চল্লিশের মত, চুলে পাক না ধরলেও হালকা হতে শুরু করছে, একজোড়া ওয়্যার-ফ্রেম চশমার ভেতর ঠাণ্ডা হিম সাপের চোখ অন্তর ভেদ করে যায়।

'মি. টড। আমি জেফ রিকার্ড।'

'আমি জানি আপনি কে,' জবাব দিলেন জোনাথন টড। ভারী, গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। এয়ারপোর্টের জেনারেল ম্যানেজার না হয়ে রেডিওর ঘোষক হলেই গলাটা মানাত ভাল। আমেরিকার কোন কোন এয়ারপোর্ট আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন এটা একটা। এ ধরনের এয়ারপোর্টগুলো সরকার কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে, শেয়ার হোল্ডাররাই বা কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে, তা নিয়ে মাঝে মধ্যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কোন এয়ারপোর্টে এককভাবে কোন ব্যক্তির সার্বিক কর্তৃত্ব থাকে না, কিন্তু নিউআর্ক এয়ারপোর্টে জোনাথন টড প্রায় একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করতে চলেছেন। তাঁর মত দায়িত্বসচেতন, কঠোর পরিশ্রমী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং বুদ্ধিমান একজন যে নিজগুণে বিস্তর ক্ষমতার অধিকারী হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি।

'তাহলে আপনি জানেন, আমি আপনার পূর্ণ সহযোগিতা পাব

বলে আশা করি,’ জেফ রিকার্ড বললেন।

এক মুহূর্ত কোন উত্তর দিলেন না জোনাথন টড। সি.আই.এ. চীফের মুখের ওপর ঠাণ্ডা চোখ বুলিয়ে চেয়ার ছাড়লেন। ‘এইটুকু জানি আমি,’ বললেন তিনি। ‘আমাকে নির্দেশ দেয়ার ক্ষমতা সি.আই.এ. রাখে না। আমরা কেউ এখানে সি.আই.এ-র নির্দেশ মানতে বাধ্য নই। এয়ারপোর্ট বন্ধ করে দেয়ার সময় বা ইচ্ছে, কোনটাই নেই আমাদের। এখন আমাকে ওয়াশিংটনে একটা ফোন করতে হবে।’

‘হ্যাঁ, করবেন বৈকি,’ একটুও অবাক হননি জেফ রিকার্ড। ‘তবে তার আগে হয়তো আপনাকে আমার জানানো উচিত যে এখানে আমি সি.আই.এ. ডিরেক্টর হিসেবে আসিনি। এসেছি ফেডারেল মার্শাল হিসেবে। এই এয়ারপোর্ট জাতীয়করণ করার আইনগত অনুমতিও সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। হ্যাঁ, ঠিকই ভাবছেন আপনি, ইমার্জেন্সী পাওয়ার অ্যাক্ট-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনুমতিটা দেয়া হয়েছে আমাকে।’ পকেটে হাত ভরে চিঠিটা বের করলেন তিনি। জোনাথন টডের মুঠোয় সেটা গুঁজে দিয়ে হাত বাড়ালেন ফোনের দিকে।

‘কি করছেন?’ জিজ্ঞেস করলেন জোনাথন টড।

‘সাহায্য,’ বললেন জেফ রিকার্ড। ‘আপনাকে। ওয়াশিংটনের সাথে কথা বলবেন না?’

জেফ রিকার্ড শুনতে পেলেন অপর প্রান্তে বেল বাজছে। তারপর তিনি নিজের পরিচয় দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করলেন। অপরপ্রান্ত থেকে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর হ্যালো বলল। সি.আই.এ. চীফ বললেন, ‘আমি চাই তুমি এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের সাথে কথা বলো।’ রিসিভারটা এবার তিনি জোনাথন টডের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। ‘নিন, কথা বলুন। প্রেসিডেন্ট।’

□

ত্রিশ মিনিটের মধ্যে নিউআর্ক এয়ারপোর্টে প্লেন আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। টেক-অফ করার জন্যে তেরোটা প্লেন অপেক্ষা করছিল, এখন থেকে ওগুলো জেফ রিকার্ডের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষাই করতে থাকবে। আরও আটটা মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল, এক এক করে সেগুলোকে নির্দেশ দেয়া হলো আশপাশের এয়ারপোর্টগুলোয় ল্যাণ্ড করো। টার্মিনাল লোকে লোকারণ্য, কিন্তু কাউকে প্লেনে চড়তে দেয়া হলো না। শুধু তাই নয়, ডিপারচার লাউঞ্জ থেকে সব লোকজনকে আরও নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

বাইরেও সমস্ত তৎপরতা থেমে গেল। এয়ারফিল্ড ছেড়ে চলে যেতে বলা হলো পোর্টারদের। গ্রাউণ্ড কনট্রোলারস এবং মেইণ্টেন্যান্স স্টাফদের যে-ক'জনকে দরকার তাদের রেখে বাকি সবাইকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেয়া হলো, তবে দরকারের সময় ডাকলেই তারা চলে আসবে। আর থাকল ফোর্ট ডিক্সের দুশো ট্রুপ।

অবজারভেশন ডেকের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন জেফ রিকার্ড, তুমুল বর্ষণে গোটা এয়ারফিল্ড ঝাপসা হয়ে আছে। এফ.এ.এ-র উইলি কিপার তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'ঘাবড়াবেন না, স্যার,' বলল সে। 'ঝড়-বৃষ্টি যতই জোরাল হোক, তার মধ্যে আপনি যদি গাড়ি চালাতে পারেন, তাহলে পাইলট প্লেনও ল্যাণ্ড করাতে পারবে।'

'আমাকে হতাশ করলেন। এই অবস্থায় আমি গাড়ি চালাতে রাজি নই।'

উইলি কিপার হাসল। 'আবহাওয়া সমস্যা হতে যাচ্ছে কিনা এখুনি তা বলার উপায় নেই। হাতে কম করেও এখনও চল্লিশ মিনিট সময় রয়েছে। আর তাছাড়া, বিকল্প ব্যবস্থা তো করাই আছে, তাই না?'

'হুম।' মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। এয়ারফোর্স এসকর্ট ব্যবহার করার বুদ্ধিটা তাঁরই। একটাই উদ্দেশ্য ছিল, রানা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছে জেট প্লেনটা, পুবদিকে পাবে লম্বা সৈকত, বিপদ টের পেয়ে রানা যদি প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দেয়?

তা রানা দেয়নি, এবং এখন আর তা করা সম্ভব নয়। জেটের দু'পাশে এসকর্ট ঠিকই এতক্ষণে লক্ষ করেছে ও। দুদিকে আঠার মত লেগে আছে দুটো এফ-ফিফটিন।

এসকর্ট এখন আরেক কাজে লাগবে। আবহাওয়ার জন্যে প্লেনটাকে যদি অন্য কোন এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করতে হয়, এফ-ফিফটিন দুটোও থাকবে সাথে। আশপাশের শহরে, উপকূলে, বা সাগরে, যেখানে যত ফেডারেল এজেন্ট আর ট্রুপস আছে, সবাইকে সতর্কাবস্থায় রাখা হয়েছে। শুধু যোগাযোগের অপেক্ষা, সাথে সাথে রওনা হয়ে যাবে তারা। কোথাও কোন ফাঁক রাখা হয়নি। সব দিক থেকে কাভার দেয়া হয়েছে রানাকে। পালাবার তার কোন উপায় নেই। শুধু একটা কথা ভেবে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি। রানার প্লেন যদি অন্য কোথাও ল্যাণ্ড করে, প্লেনের আগে সেখানে তাঁর পৌঁছানো সম্ভব নয়।

অথচ রানা প্লেন থেকে নেমে আসার সময় সেখানে তিনি উপস্থিত থাকতে চান।

মোলাঞ্জা রমিউলাস প্লেনের সামনের অংশে বসে আছে। পিছনের চেয়ে সামনেই কম লাগে ঝাঁকি আর আওয়াজ। তবুও বেশিরভাগ সময় চোখ বুজে আছে সে। প্লেনে ওঠার আগে ঘুমের বড়ি খেতে চেয়েছিল সে, কিন্তু রানা তাকে বারণ করেছে।

এমনিতে ভয় পায়, তার ওপর ঝড়ের মধ্যে পড়েছে প্লেন। সীটের হাতল ধরা হাতের আঙুল সাদা হয়ে গেছে তার। এই

মুহূর্তে পাশে বসা গ্রীক অর্থোডক্স প্রিস্টের চেয়ে সে-ই ঈশ্বরকে বেশি স্মরণ করছে। ঠোঁট জোড়া সারাক্ষণ নড়ছে তার, নিঃশব্দে।

মাঝে মধ্যে চোখ খুলছে রমিউলাস। বাঁ দিকে জানালা। চট্ করে একবার তাকিয়েই ফিরিয়ে নিচ্ছে চোখ। দৃষ্টি চলে না, কিছুই দেখার নেই। ঘন কালো মেঘ যেন গিলে ফেলেছে প্লেনটাকে।

আবার চোখ বুজে রানাকে অভিশাপ দিল সে, ব্যর্থ চেষ্টা করল নিজেকে শান্ত করার। তারপর তার মনে পড়ল উপহার হিসেবে রানার কাছ থেকে কি পাবে সে।

অমূল্য একটা তথ্য। তার প্রতিষ্ঠানে একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। নামটা জানার জন্যে দরকার হলে আরও হাজার বার প্লেনে চড়তে রাজি আছে সে।

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠতেই ছোঁ দিয়ে ফোনের রিসিভার তুলল পিকেরিং।

অপরপ্রান্তের লোকটা নিউআর্ক এয়ারপোর্টের গ্রাউণ্ড ক্রু, বিশ বছরের চাকরি তার। 'যা যা জানতে চেয়েছিলেন সব এখন বলতে পারব আমি।'

'শোনাও।'

'আবহাওয়া আরও খারাপ না হলে প্লেনটাকে ওরা নামাতে দেবে,' বলল গ্রাউণ্ড ক্রু। 'তারপর ওরা এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে করে বেরিয়ে যাবে। সামনে থাকবে দুটো আর্মি ইউনিট, পিছনে থাকবে দুটো আর্মি ইউনিট। সোজা ফোর্ট ডিক্সে ফিরবে ওরা, ওখানে ওদের জন্যে এয়ারফোর্স ওয়ান অপেক্ষা করছে।'

'তুমি ঠিক জানো?'

'পজিটিভলি। সিকিউরিটিতে আমার বন্ধু আছে, সরাসরি তার মুখ থেকে শুনেছি।'

'কি ধরনের গাড়ি?' জানতে চাইল পিকেরিং।

'গাড়িটাই সমস্যা হবে। ওটা একটা আর্মার্ড কার। ট্যাংকের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।'

পিকেরিঙের কপালে চিন্তার রেখা ফুটল। এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, টিউলিপকে তারা এয়ারপোর্ট থেকে ছিনতাই করতে পারবে না। কাজটা সারতে হবে নিউ আর্ক আর ফোর্ট ডিক্সের মাঝখানে কোথাও। রাস্তার তলায় ডিনামাইট বসিয়ে আর্মি কারগুলোকে ধ্বংস করা কঠিন কোন কাজ নয়, দেখে মনে হবে আয়োজনটা রানাই আগে থেকে করে রেখেছিল। কিন্তু আর্মার্ড কার-কে থামাবার মত যথেষ্ট ডিনামাইট ব্যবহার করলে ভেতরে যারা থাকবে তারা সবাই মারা পড়বে।

মৃত টিউলিপকে কারও কোন দরকার নেই।

'আরোহীদের কোথায় থাকতে দেয়া হয়েছে?' জানতে চাইল পিকেরিং।

'মেইন টার্মিনালে।'

'ওখানকার সিকিউরিটি?'

'নেই। তবে এয়ারফিল্ড আর গাড়িটার কাছে অনুমতি ছাড়া কেউ যেতে পারবে না।'

'গাড়ির কাছে তুমিও যেতে পারবে না?'

'তা হয়তো পারব। এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।'

'গুড,' বলল পিকেরিং। 'শোনো আমরা কি করব। আরোহী হিসেবে একজন লোককে পাঠাচ্ছি। সে তোমাকে একটা প্যাকেট দেবে।'

'প্যাকেট?'

'একটা টাইম মেকানিজম,' পিকেরিং বলল। 'আর যথেষ্ট প্লাস্টিক। বিস্ফোরণে গাড়ির দরজাগুলো খুলে যাবে।'

রমিউলাসের পাইলট রেডিও খুলল। 'নিউআর্ক অ্যাপ্রোচ কনট্রোল, দিস ইজ চ্যারিয়টিয়ার সেভেন। ডু ইউ রিড মি?'

সাথে সাথে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর শোনা গেল দ্রুতগতি শব্দজট। সব শেষে যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'দিস ইজ নিউআর্ক। রিড ইউ, চ্যারিয়টিয়ার। হাউ ইজ দা ওয়েদার আপ দেয়ার?'

'চপি। হেভী ক্লাউডস। নাথিং উই ক্যান-নট হ্যাণ্ডল অন ইনসট্রুমেণ্টস।'

'দা উইণ্ড ইজ আউট অভ দা নর্থ ইস্ট অ্যাট টোয়েনটি সিক্স নটস অ্যাণ্ড গাস্টিং। ডু ইউ হ্যাভ এনি ডাউট অ্যাবাউট ল্যাণ্ডিং?'

'নান্,' শান্তভাবে উত্তর দিল পাইলট। তারপর সে আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুরোধ করল, 'চ্যারিয়টিয়ার সেভেন রিকোয়েস্টিং ফাইনাল অ্যাপ্রোচ টু নিউআর্ক অন ইনসট্রুমেণ্টস।'

আবার সাড়া পেতে বেশ একটু দেরি হলো। 'রাইট, চ্যারিয়টিয়ার। টার্ন লেফট থ্রী জিরো সিক্স।'

'লেফট থারটি সিক্স,' বলল পাইলট।

'উই আর হ্যাণ্ডিং ইউ অফ টু দা টাওয়ার নাউ।'

'রজার, অ্যাপ্রোচ কনট্রোল। দিস ইজ চ্যারিয়টিয়ার সেভেন, আউট।'

পাইলট মাথা ঝাঁকিয়ে শেষ বারের মত ল্যাণ্ডিং সিস্টেম আর ব্রেক চেক করার নির্দেশ দিল কো-পাইলটকে। তারপর থ্রটল ঘুরিয়ে 306 ডিগ্রী বাঁক নিতে শুরু করল।

টাওয়ারে দাঁড়িয়ে রাডার স্কোপের খুদে আলোক বিন্দুটার দিকে তাকিয়ে আছেন জেফ রিকার্ড, বিন্দুটা ধীরে ধীরে ডান দিকে সরে যাচ্ছে।

'নিউআর্ক টাওয়ার, দিস ইজ চ্যারিয়টিয়ার সেভেন। উই জাস্ট টার্ন অন ফাইনাল।'

হেডসেট পরা রাডার স্কোপের সামনে বসা লোকটা মুখ তুলে জেফ রিকার্ডের দিকে তাকাল। তারপর মাউথ পীসে বলল, 'উই আর চার্টিং ইউ, চ্যারিয়টিয়ার। রাইট হেডিং টু-জিরো। ইউ আর ক্লিয়ারড ফর রানওয়ে ফোর-ই।'

'রাইট, নিউআর্ক। ডিসেনডিং টু ওয়ান থাউজ্যাণ্ড ফিট।'

হেডসেট পরা অপারেটর সি.আই.এ. চীফের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করল, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না।

'ব্রেক সিস্টেম?' কো-পাইলটকে জিজ্ঞেস করল পাইলট।

'ওকে।' উত্তর এল।

'ল্যাণ্ডিং গিয়ার?'

'ইন প্লেস অ্যাণ্ড লকড্।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর আবার শোনা গেল পাইলটের গলা, 'উই আর অ্যাট টু থাউজ্যাণ্ড ফিট, নিউআর্ক।'

'অ্যাণ্ড ক্লিয়ারড ফর ফাইনাল অ্যাপ্রোচ,' বলল অপারেটর। 'ব্রিং হার অন ডাউন।'

'রজার।'

প্রায় ছুটতে ছুটতে একটা প্রাইভেট এলিভেটরে ঢুকলেন জেফ রিকার্ড, সাথে উইলি কিপার। নিচেরতলায় নেমে এসে দেখলেন, ওঁদের জন্যে একটা ব্যাগেজ ট্রাক অপেক্ষা করছে। গিয়ার দিল ড্রাইভার, কিপারের পিছু পিছু লাফ দিয়ে ট্রাকের পিছনে উঠে পড়লেন জেফ রিকার্ড। ফোর-ই রানওয়ের দিকে ছুটল ট্রাক।

চশমা থেকে বৃষ্টির পানি মুছলেন জেফ রিকার্ড। উত্তেজনায় উল্লাসিত হয়ে আছে তাঁর চেহারা। তালু ঘামছে। পাঁজরের গায়ে দ্রিম দ্রিম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। ফিল্ডের দিকে চোখ পড়তে দেখলেন, সৈনিকরা চারদিকে পজিশন নিয়েছে। নিউআর্ক এয়ারপোর্ট থেকে পিঁপড়ে গলে বেরোবার উপায় নেই।

রানা তাহলে ধরা পড়ল। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই টিউলিপ কনওয়েকে ফিরে পাবেন তিনি।

দেখার আগেই প্লেনের আওয়াজ পেলেন তিনি। তারপর নিচু স্তরের মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল জেটটা। দ্রুত, সাবলীল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে। সরাসরি রানওয়ের দিকে।

'এসো রানা,' বিড়বিড় করে বললেন জেফ রিকার্ড।

শুনতে পেয়ে হেসে উঠল উইলি কিপার।

তারপরই থেমে গেল হাসি, কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে। চোয়াল ঝুলে পড়ল, বিস্ফারিত হলো চোখ। জেফ রিকার্ডেরও একই অবস্থা। বুকের ভেতর লাফ দিয়ে উঠল হৃৎপিণ্ড। আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন তিনি।

বড় বেশি দ্রুতবেগে খসে পড়ছে প্লেন। রানওয়ের দিকে নয়, পেভমেন্টের দিকে ধেয়ে আসছে।

উইলি কিপারের বিকট চিৎকার শুনতে পেলেন জেফ রিকার্ড, 'বাতাসের ধাক্কা!'

দমকা বাতাস। ঝড়ের স্বাভাবিক গতির চেয়ে অনেক বেশি গতি, অনেক বেশি শক্তিশালী—এই অবস্থায় পড়ে বহু প্লেন ডিগবাজি খেয়ে বিধ্বস্ত হয়েছে।

প্লেন ওপরে তোলার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল পাইলট, কিন্তু রানওয়ের বড় বেশি কাছাকাছি নেমে এসেছে আগেই। পোর্ট সাইডে কাত হয়ে রয়েছে জেট। ডান দিকের ডানা তুলতে গিয়ে অনেক বেশি তুলে ফেলল, সেই সাথে অনেক বেশি নিচের দিকে নেমে গেল বাঁ দিকের ডানা। উঁচু আকাশে ফিরে যাবার চেষ্টা বাদ দিল পাইলট, প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল এবার।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন খচ্ করে বিঁধল জেফ রিকার্ডের মনে। রানা কি নিজেই প্লেন চালাচ্ছে? গোটা ব্যাপারটা কি তার চালাকি? ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পালাবার পথ তৈরি করতে চায়?

পেভমেন্ট স্পর্শ করল প্লেন। উঁচু হয়ে থাকল নাক। প্রথমে নামল চাকাগুলো। পেভমেন্ট ধরে ছুটল জেট, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল লক্ষ কোটি আগুনের ফুলকি। তারপর সমান হলো পেট।

জেফ রিকার্ডের মনে হলো, হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। চোখের সামনে দৃশ্যটা মিথ্যে বলে মনে করার চেষ্টা করলেন তিনি। সশস্ত্র সৈনিকরা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক ছুটছে, আড়াল খুঁজছে তারা। পিছন থেকে ভেসে এল সাইরেনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ, প্লেনের দিকে রওনা হয়ে গেছে কয়েকটা ফায়ার ট্রাক। প্লেনের চাকা গড়াচ্ছে না, হড়কাচ্ছে। পেভমেন্টের কিনারা থেকে নামার সময় সিগন্যাল লাইট ভেঙে চুরমার করে দিল। তারপর কাদা আর ঘাসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ, আর যেন এগোবার শক্তি নেই।

তুমুল বৃষ্টিতে নিভে গেল ফুলকিগুলো। আগুনের কোন বিস্ফোরণ ঘটল না। নিরাপদে নেমে এসেছে চ্যারিয়টিয়ার সেভেন।

চোখ বুজে সীটে হেলান দিলেন জেফ রিকার্ড। ভয় কেটে গিয়ে হঠাৎ পরম স্বস্তি বোধ করায় আশ্চর্য দুর্বল লাগল নিজেকে তাঁর। তারপর দ্রুত চোখ খুললেন, জোরে একবার ঝাড়া দিলেন মাথাটা। হ্যাচ খুলে গেছে, প্লেনের দরজায় পাইলটকে দেখা গেল। প্লেনের পেটে সিঁড়ি লাগানো হলো।

ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নামলেন জেফ রিকার্ড, ছুটলেন প্লেনের দিকে। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মোলাঞ্জা রমিউলাস। চোঙ আকৃতির মুখে কোন রক্ত নেই। চোখ দুটো বিস্ফারিত, বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার পিছু পিছু এল কালো স্যুট পরা এক লোক, তার পিছনে আরেকজন।

চোখ সরু করে তাকালেন জেফ রিকার্ড। খোলা দরজায় কালো আলখাল্লা পরা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজন প্রিস্ট। দু'জনের চোখ এক হলো, কিন্তু ভাবের কোন আদান-প্রদান হলো

না। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগল প্রিস্টও।

ইস্টার্ন জেট রানওয়েতে থামল, ঘাড় ফিরিয়ে সীট-মেটের দিকে তাকাল গিয়াকোমো অগাস্টিন। 'অত্যন্ত খুশি হলাম আপনার সাথে আলাপ করে,' বলল সে।

'মাই প্লেজার,' অপর লোকটা নিঃশব্দে হাসল। 'স্বীকার করা উচিত, এর আগে কোন প্রফেশনাল গলফার-এর সাথে আমার পরিচয় হয়নি। পি.জি.এ. প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হোন, এই প্রার্থনা।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ।'

সীট ছেড়ে উঠল গিয়াকোমো অগাস্টিন, প্লেন থেকে নামার জন্যে আরোহীদের সাথে লাইন দিল। কয়েক সেকেণ্ড পরই খুলে গেল দরজা, এক এক করে নামতে শুরু করল আরোহীরা।

একজন স্টুয়ার্ডেস আগেই তার গলফ ব্যাগটা বের করেছে। বড়সড় প্রফেশনাল মডেল। ফার্স্ট আর ট্যুরিস্ট ক্লাস কেবিনের মাঝখানে ক্লজিটের ভেতর ছিল ওটা। গিয়াকোমো অগাস্টিনকে এগিয়ে আসতে দেখে হাসল মেয়েটা। বলল, 'আমার ধারণা, গলফ ব্যাগটাকে আপনি কখনও ব্যাগেজ হিসেবে লেখান না।'

'নো, ম্যা'ম,' ভুবন ভোলানো হাসি দেখা গেল সুদর্শন গিয়াকোমো অগাস্টিনের মুখে। 'এই ক্লাবগুলো আমার জীবন আর শরীরের অঙ্গ।'

বাইরে রোদ ঝলমলে প্রকৃতি। মৃদু বাতাসে পাম গাছের পাতা ঝিরঝির আওয়াজ করছে। মিয়ামি। তাপমাত্রা আশি ডিগ্রী।

গভীর করে শ্বাস টানল রানা। পিঠে গলফ ব্যাগ ঝুলিয়ে সামনে এগোল ও। সুপুরুষ, সপ্রতিভ, নিশ্চিন্ত। নিউআর্ক এয়ারপোর্টে যে প্রিস্টকে দেখা গেছে সে ছিল মোলাঞ্জা রমিউলাসের আরেকজন চাকর। ওই প্লেনের ধারে কাছে কখনও

যায়নি রানা। যায়নি টিউলিপ কনওয়েও।

এগারো

'চলো দূতাবাসে যাই,' বলল সারটভ। 'ওরা তোমাকে ডেকেছে।'

একদৃষ্টে সারটভের চেহারা দেখল পিকেরিং। কিছুই বোঝা গেল না, সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তাই অনেক কিছু ফাঁস করে দেয়। অ্যাসাইনমেণ্টের বারোটা বেজে গেছে, চরম ব্যর্থতা। শেষ চেষ্টা করে দেখা হয়েছে নিউআর্কে। যে-কোন সরকারের উঁচু মহলে সহিl্তা দুর্লভ একটা ব্যাপার; যাওবা একটু ছিল, ভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গেছে মস্কোর।

না বোঝার ভান করল পিকেরিং। 'কেন?'

'জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল সারটভ। 'ওরা সম্ভবত তোমাকে বাড়িতে ফেরত পাঠাবে।'

বাড়ি? কোথায় সেটা? মস্কোয়? কৃlসাগরের তীরে সাজানো একটা বাংলো? সুখস্বপ্ন, কিন্তু মিছে আশা। তাকে আর দরকার নেই মস্কোর। সে যা জানে সব তারা জেনে নেবে, সব বের করে নেবে নিংড়ে, তারপর ছিবড়ের মত ফেলে দেবে। কিংবা আরও খারাপ কিছু ঘটবে। বিশ্বাসঘাতকের মুখোশ উন্মোচিত হলে সে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। একবার দল বদল করলে, আবারও সে তাই করতে পারে। না, পিকেরিঙের মনে কোন মিথ্যে আশা নেই। পরিচয় ফাঁস হওয়ার সাথে সাথে তার প্রয়োজন এবং মূল্য ফুরিয়েছে। অতীতের বিশ্বস্ততার জন্য বর্তমানের ঝুঁকিকে কেউ

ছোট করে দেখে না। কে.জি.বি. তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না।

মাথা ঝাঁকাল পিকেরিং। 'চলো। দাঁড়াও, ব্যাগটা গুছিয়ে নিই।'

নিউআর্কে ব্যর্থ হবার পর এই অ্যাপার্টমেন্টে এসে উঠেছে ওরা। নিউআর্ক থেকে চলে এসেছে ওয়াশিংটনে, পিকেরিঙের বাসা থেকে এই অ্যাপার্টমেণ্ট খুব বেশি দূরে নয়।

প্লেনে নেই জানার পর, বহু চেষ্টা করেছে কোথায় সে থাকতে পারে জানার জন্যে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। রানার কোন খবর তারা সংগ্রহ করতে পারেনি।

এখন আর তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না।

অ্যাসাইনমেণ্টটা সম্পর্কেও পিকেরিঙের কোন ভুল ধারণা নেই। মস্কোর সিদ্ধান্তই ঠিক, ওরা ব্যর্থ হয়েছে। অনেক দিন কোন যোগাযোগ নেই সি.আই.এ-র সাথে, এর কোন ব্যাখ্যা জেফ রিকার্ডকে দিতে পারবে না সে। এখন জেফ রিকার্ড শুধু সন্দেহ করছেন না, তিনি জানেন। না, তার আর ফিরে যাবার পথ নেই। ল্যাংলি এখন আর তার অফিসের ঠিকানা নয়। নয় দযেরঝিনস্কি স্কয়্যারও।

পাশের ঘরে চলে এল পিকেরিং। মনটা স্বভাবতই খারাপ। তাড়াহুড়ো করে কয়েকটা জিনিস সুটকেসে ভরে নিল সে। তারপর পিস্তলটা নিল।

ফিরে এসে পিকেরিং দেখল, চেয়ারে বসে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে সারটভ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, উঠে দাঁড়াতে গেল।

গুলি করল পিকেরিং।

বিস্মিত হবার সুযোগটাও পেল না সারটভ। দু'চোখের মাঝখানে ঢুকল বুলেটটা, মাথার পিছনটা বিস্ফোরিত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। বুলেটের ধাক্কায় আবার চেয়ারে বসে পড়ল

সারটভ। বসেই মারা গেল লোকটা, কি ঘটেছে না বুঝেই।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল পিকেরিং। কোথায় যাবে জানে না। কিন্তু জানে কি করতে হবে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এখনও তার একমাত্র ভরসা টিউলিপ কনওয়ে। প্রেসিডেন্টের মেয়েকে জিম্মি রাখতে পারলে সে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনা চালাতে পারবে।

সে যা যা জানে, জেফ রিকার্ড সব জানতে চাইবে। কিন্তু টিউলিপ হাতে থাকলে আলোচনাটা হবে তার সুবিধেমত। জানতে চাও জানো সব, কিন্তু বিনিময়ে চাই যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমা এবং রাশিয়ার হিংস্রতা থেকে নিরাপদ আশ্রয়।

একজন জিম্মি দরকার তার। টিউলিপ কনওয়ে। কিন্তু টিউলিপকে পেতে হলে রানাকে পেতে হবে আগে। ইশ্‌শ্‌, কেন যে এই লোকটাকে বাছাই করেছিল সে!

ওভাল অফিসের বাইরে দাঁড়ানো সেক্রেটারির উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড। তারপর দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ডেস্কের পিছনে বসে আছেন রিচার্ড কনওয়ে। বন্ধুকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকালেন তিনি।

জেফ রিকার্ড হ্যালো বললেন না। দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসলেন। 'পামেলাকে ফোনে ডেকে পাঠাও,' বললেন তিনি। 'তোমাদের দু'জনের সাথেই আমার জরুরী কথা আছে।'

'কি কথা?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'একটা বুদ্ধি পেয়েছি,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'রানাকে আটকাবার জন্যে ফাঁদ পাতব।'

বারো

মানুষটা সুঠামদেহী। মিশমিশে কালো চুল ব্যাকব্রাশ করা। চকচকে ধাতব সাইনবোর্ডের ওপর একবার চোখ বুলাল সে। এ.জি.ভি.এ.। আমেরিকান গিল্ড অভ ভ্যারাইটি আর্টিস্টস—ওয়াশিংটন অফিস। একটা হাত তুলে বোতামে চাপ দিল সে। ভেতরে একটা বেল বাজার সাথে দরজার অটোমেটিক তালা খুলে গেল। কবাটে ঠেলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

রিসেপশনিস্ট মেয়েটাকে দেখে মনে হলো বোধহয় কিছুদিন আগেও শো-গার্ল ছিল। দেখতে ভালই, নিখুঁত মেকআপ নেয়ায় আরও ভাল লাগছে। সকালের প্রথম কাপ কফি থেকে মুখ তুলে তাকাল সে। আগন্তুককে দেখে মিষ্টি করে হাসল।

'ইয়েস, স্যার?'

দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এল আগন্তুক। তার হাঁটার সপ্রতিভ, সাবলীল ভঙ্গি দেখে মুগ্ধ হলো রিসেপশনিস্ট, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার একটা তাগাদা অনুভব করল। মনে হলো কর্তৃত্ব আর প্রভাবের একটা অদৃশ্য বলয় সারাক্ষণ ঘিরে আছে লোকটাকে। পরনে অত্যন্ত দামী স্যুট, পালিশ করা নখ, জুতোয় মুখ দেখা যায়। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে হীরের আংটিটা জানালা পথে আসা রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল।

'আমি এম.এন. গডফেলো।'

এবার সটান দাঁড়িয়ে পড়ল রিসেপশনিস্ট। এম.এন. গডফেলো আমেরিকার বড় একটা সার্কাস পার্টির মালিক, গিল্ডের বেশিরভাগ সদস্য-সদস্যার চাকুরিদাতা। শুধু ওয়াশিংটনে নয়, হলিউডেও তার সমান প্রতিপত্তি। শো-বিজনেসের যাদুকর বলা হয় তাকে। আয়োজনের পিছনে যেমন টাকার সাগর উপুড় করতে পারে, তেমনি তার উর্বর মস্তিষ্ক থেকে অহরহই বেরিয়ে আসে নিত্য-নুতন চমক লাগানো অনুষ্ঠান-সূচী। এর আগে কখনও গিল্ড অফিসে আসেনি সে, ফোন করেনি। তার কাজ করে দেয়ার জন্যে এক পাল লোক আছে।

'ইয়েস, মি. গডফেলো?'

'একটা নাম আর ঠিকানা দরকার,' বলল রানা। জানে, গডফেলো খোশগল্প করে সময় নষ্ট করার লোক নয়। 'আমার খুব তাড়া আছে। আজই আমি ইউরোপ রওনা হব।'

গিল্ডের পত্রিকা ভ্যারাইটিতে তাই বলা হয়েছে। শো-বিজনেসে যারা কেউকেটা তাদের সমস্ত খবর এই পত্রিকায় ছাপা হয়, কারও সর্দি লাগলে সেটাও।

'কি নাম, স্যার?' সবিনয়ে জানতে চাইল রিসেপশনিস্ট।

নিজের সমস্যাটা ব্যাখ্যা করল রানা।

দশ মিনিট পর মেয়েটার হাতে একটা ফাইল দেখা গেল। 'এই নিন, স্যার,' বলল সে। 'রিপ নরটন। গেইথার্সবার্গ, মেরীল্যাণ্ডে থাকেন উনি।'

নোটবুকে নামটা লিখে নিল রানা। তারপর ঠিকানা। 'ফোন?'

রিসেপশনিস্ট মাথা নাড়ল। 'তার ফোন নেই, স্যার।'

নেই, ভালই তো।

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। নোটবুক পকেটে ভরে মেয়েটার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, তারপর বেরিয়ে এল অফিস থেকে।

রিপ নরটন মধ্য বয়স্ক, মাথায় চকচকে টাকের বিস্তার ঘটতে শুরু করেছে। অসংখ্য রেখা আর ভাঁজ তার মুখে, চোয়ালের নিচে ঢিলে হয়ে ঝুলে আছে চামড়া, বয়সের তুলনায় অনেক বেশি। অতিরিক্ত মদ্য পানের কুফল। অবশ্য কাজ করতে তার কোন অসুবিধে হয় না, যত নেশাই হোক কাজের সময় সব টুটে যায়। তবে তার দরজায় রানা যখন উপস্থিত হলো, মদে একেবারে চুর হয়ে আছে সে। রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন অন্তরের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। 'কি যেন পরিচয় দিলেন?'

'আমি এ.জি.ভি.এ-র গ্যালি সোবার্স,' আবার বলল রানা। 'ফোনই করতাম, কিন্তু আমাদের কাছে আপনার নাম্বারটা নেই।'

দরজার কাছ থেকে পিছিয়ে যেতে শুরু করে হাসল রিপ নরটন। 'ফোনই রাখি না, নাম্বার পাবেন কিভাবে! ঢুকে পড় ন।'

'ধন্যবাদ।'

একটা চেয়ার থেকে একজোড়া মোজা সরিয়ে বসল রানা। 'আপনার জন্যে আমি একটা দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি, মি. নরটন।'

মুখের কাছে গ্লাস তুলল নরটন। জল-রঙ তরল পদার্থ, দেখে পানি মনে হলেও তা নয়। ঢক ঢক করে দু'ঢোক খেলো সে। 'দুঃসংবাদ যত তাড়াতাড়ি শোনা যায় ততই ভাল।'

'পিকনিকটা বাতিল করা হয়েছে।'

প্রথমে হতাশা, তারপরই নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটে উঠল নরটনের চেহারায়। 'এরকম আগেও হয়েছে। কি আর করা—কপাল মন্দ।'

'তবে,' তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'আপনার জন্যে আরেকটা অফার আছে। দ্বিগুণ পারিশ্রমিক, সমস্ত খরচ কোম্পানির।'

রক্ত বর্ণ চোখের দৃষ্টি এতটুকু বদলাল না। 'রাজি না হবার কি

কারণ আছে?' সিলিঙের দিকে চোখ মটকে হাসল নরটন, এক ঢোকে গ্লাসটা খালি করে ফেলল।

'কোন কারণ নেই,' বলল রানা। পকেট থেকে বের করে দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর একটা এয়ারলাইন টিকেট ফোল্ডার ফেলল ও। তারপর সেটার ওপরে বিশটা একশো ডলারের নোট রাখল।

নরটন টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল। কুঁচকে আছে ভুরু। হাত বাড়িয়ে টাকাগুলো নিল সে, গুনল। অবাক চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে। এখন আর নির্লিপ্ত নয় চেহারা। 'মাই গড, তারমানে আপনি সিরিয়াস!'

'অবশ্যই সিরিয়াস।'

টিকেট ফোল্ডার নিয়ে খুলল নরটন। আবার অবাক হয়ে তাকাল রানার দিকে। 'নাইরোবি?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওখানে একটা সার্কাস পার্টির সাথে ছয় হ্‌প্তার এনগেজমেন্ট।'

'কিন্তু আমি? আমাকে কেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ওদের একজন স্টার ক্লাউন দরকার, আর কোথাও যার চুক্তি নেই।' সামনের দিকে ঝুঁকল ও। 'এটা মাত্র স্রেফ অগ্রিম। এর অর্ধেক খরচের খাতে ধরা হবে। বাকিটা আপনার প্রথম সাপ্তাহিক বেতন।'

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল রিপ নরটন।

'আজই আপনাকে ফ্লাইট ধরতে হবে,' বলল রানা। 'কাল রাতটা আপনাকে লণ্ডনে কাটাতে হবে, পরদিন পৌঁছে যাবেন নাইরোবি। পারবেন তো?'

'পারব?' ঠোঁট মুড়ে হাসল নরটন। 'আপনি ঠাট্টা করছেন? এই পরিমাণ টাকা পেলে নাইরোবি কেন, চাঁদে যেতেও আমার

আপত্তি নেই!’

হোয়াইট হাউসের উত্তরে, ফরটি্‌ স্ট্রীটের একটা বারে ঢুকল পিকেরিং। রঙচটা জিনস আর পুরানো শার্ট পরে আছে সে, ক্যাপটা ভুরুর কাছে নামানো। তাকে আসতে দেখে বারটেণ্ডার তাকাল কি তাকাল না। শেষ মাথার একটা বুদে ঢুকল পিকেরিং।

সময় মত ওয়েট্রেস এল। বিয়ারের অর্ডার দিল পিকেরিং। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল ফোন বুদে লোক রয়েছে। তারমানে অপেক্ষা করতে হবে।

সি.আই.এ-র ভেতর বিশ্বস্ত দু’চারজন যারা আছে, আবার তাদের সাথে যোগাযোগ করবে পিকেরিং। ওরাই এখন তার শেষ অবল’ন, যদিও তেমন শক্তিশালী নয়। এখন পর্যন্ত এমন কোন সূত্র বা তথ্য ওরা দিতে পারেনি যার সাহায্যে মাসুদ রানার সন্ধান করা যায়। তবে ওদের তথ্য থেকেই জানা গেছে, জেফ রিকার্ডও রানার সন্ধান পাচ্ছে না। তার মানে, এখনও বোধহয় খানিকটা সময় হাতে আছে তার।

ফোন করে যাকে যা বলার বলে, বার থেকে বেরিয়ে এল পিকেরিং। সামনে একটা নিউজ স্ট্যাণ্ডে দাঁড়াল, কেউ পিছু নিয়েছে কিনা দেখতে হবে। ওয়াশিংটন পোস্ট, সান্ধ্য সংস্করণ কিনল সে। না, কেউ ওর ওপর নজর রাখছে না।

কাগজের প্রথম পাতায় শুধু আন্তর্জাতিক খবর, সরকারি আর রাজনৈতিক। এখন আর এ-সবে তার আগ্রহ নেই। ভেতরের পাতা খুলল সে। স্টাইল এবং মেট্রো সেকশনের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল। তারপর, বরাবরের অভ্যেসবশে, বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ রাখল।

একটু পরই চমকে উঠল পিকেরিং। প্রথম দর্শনেই বুঝল, বিজ্ঞাপনটা তাকে উদ্দেশ্য করে ছাপানো হয়েছে। এমনিতে

বিজ্ঞাপনটা আরগুলোর মতই, কিন্তু দুটো শব্দ, বড় বড় অক্ষরে ছাপা, যার অর্থ শুধু সে আর রানা জানে।

গোলাপ কুঁড়ি।

বিজ্ঞাপনটার শিরোনাম দেয়া হয়েছে—সাহায্য প্রয়োজন।

শিরোনামের নিচে ছাপা হয়েছে—গোলাপ কুঁড়ির জন্যে ডিলার আবশ্যক। অপূর্ব সুযোগ। মুন রক। এখুনি যোগাযোগ করুন, বক্স সেভেন-ফোর-ফাইভ পি।

পিকেরিং হাসল। এও কি সম্ভব? তার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে চাইছে রানা?

এখুনি যোগাযোগ করুন মানে আজই, কিংবা আজ রাত পৌনে আটটায়। সময় মত পৌঁছুতে চাইলে দু'ঘণ্টা সময় আছে হাতে। কিন্তু পৌঁছুতে হবে আরও আগে। ইতোমধ্যে খেয়ে নেয়া দরকার, খিদে পেয়েছে। কিন্তু খেতে বসার আগে গোসল করা দরকার। কাপড় পাল্টাতে হবে।

রানার যদি কোন প্রস্তাব থাকে, অন্তত প্রায় গ্রহণযোগ্য হবে সেটা। আবার এটা ওর একটা চালাকিও হতে পারে। তবে খারাপ ভাল যাই হোক, রানাকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার একটা সুযোগ তো বটে!

মুন রক প্রদর্শনীতে নিশ্চয় যাবে পিকেরিং।

ক্যাপিটল আর ওয়াশিংটন মনুমেন্টের মাঝখানে চওড়া মল, মলের দু'পাশে নয়টা মিউজিয়ামের একটা হলো এয়ার অ্যাণ্ড স্পেস মিউজিয়াম। সুইংডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল সুদর্শন এক যুবক।

সাড়ে সাতটা বাজে। তবে প্রধান প্রদর্শনী হলের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা জানালাগুলো দিয়ে এখনও দিনের আলো ঢুকছে। প্রায় বিল্ডিংটার সমানই উঁচু সিলিং, সিলিং থেকে ঝুলছে এরোপ্লেনগুলো, দেখে মনে হলো যেন উড়তে উড়তে হঠাৎ মাঝ

আকাশে স্থির হয়ে গেছে। ওগুলোর মধ্যে রাইট ব্রাদার্সের ফ্লাইয়ার রয়েছে, রয়েছে লিণ্ডবার্গের স্পিরিট অভ সেণ্ট লুইস, বেল এক্স-ওয়ান–প্রথম যেটা শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিতে উড়েছিল। বিশাল ফ্লোর জুড়েও দেখার মত অনেক বস্তু রয়েছে–পাইওনিয়ার টেন, ফ্রেণ্ডশিপ সেভেন, জেমিনি ফোর–সবগুলো মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার সময় কালো হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড আরেক হলে, ডান দিকে, রয়েছে প্যাসেঞ্জার প্লেনগুলোর প্রথম দিককার সংস্করণ। বাঁ দিকের হলে রয়েছে নাসা-র রকেট, গাইডেড মিসাইল, বোমা নিক্ষেপণ মঞ্চসহ বাহন, এবং একটা লুনার ল্যাণ্ডিংক্রাফট।

আর আছে শয়ে শয়ে দর্শক।

বছরের এই সময়টায় ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে মিউজিয়াম। বিভিন্ন রাজ্যের ট্যুরিস্টরা তো দল বেঁধে আসেই, ওয়াশিংটনবাসীদের কাছেও এই মিউজিয়ামের আবেদন পুরানো হবার নয়। সময় পেলেই চলে আসে লোকজন। মলের উল্টোদিকে ন্যাশনাল গ্যালারির মত নয় এটা, এখানে ওখানে থেমে থেমে বা লাইন দিয়ে প্রদর্শনী দেখতে হয় না। বিশাল ফাঁকা জায়গা ছাড়া আছে, যার যেদিক খুশি এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াতে বাধা নেই।

জায়গাটাই এমন, ভিড় থাকলে নির্দিষ্ট একজন লোকের ওপর নজর রাখা প্রায় অসম্ভব।

অলসভঙ্গিতে ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছে রানা, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে, বাঁধনহীন ভবঘুরের মত লাগছে ওকে। এখানে কাউকে দেখতে আসেনি ও, দেখা দিতে এসেছে। ঘড়ির দিকে একবারও তাকাল না, তবে আন্দাজ প্রায় দশ মিনিট পর ঘুরে দাঁড়িয়ে মেইন হলের দিকে এগোল।

এক ধারের মেঝে থেকে একটা মেটাল শ্যাফট ওপর দিকে

উঠেছে, প্রায় দশ ফিটের মত। কোমর সমান উঁচুতে শ্যাফটের গায়ে একটা ফাঁক। ভেতরে ছুঁয়ে দেখার জন্যে রয়েছে চার বিলিয়ন বছরের পুরানো একটা নমুনা। চাঁদ থেকে নিয়ে আসা তেকোনা একটা পাথর। মসৃণ, কালো।

শুধু এখানেই একটা লাইন দেখা গেল। শ্যাফটের সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে মানুষ, তারপর সামনে বাড়ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় চারদিকে চোখ বুলাল রানা।

কে জানে কি করবে পিকেরিং!

সময়ের আগেই পৌঁচেছে পিকেরিং। প্রদর্শনী হলগুলো একবার দেখে নিয়ে এসক্যালেটরে চেপে ওপরতলায় উঠে এসেছে সে। ঝুল-বারান্দার রেইলের কাছে ভাল একটা আড়াল পেয়ে গেছে, সেখান থেকে লক্ষ রাখছে নিচের দিকে। কালো একটা এক্সফিফটিন, হাই অলটিচ্যুড রিসার্চ প্লেন, ঝুল-বারান্দার সমান উঁচুতে ঝুলছে—চমৎকার আড়াল। চোখে ক্যামেরা তুলল সে। টেলিস্কোপে চোখ রেখে ছবিও তুলছে, লোকজনদের চেহারাও দেখে নিচ্ছে।

সময়ের আগে রানাও পৌঁচেছে, কাজেই পিকেরিঙের চোখে ধরা না পড়ার কারণ নেই। প্রথমে পিকেরিং চেহারাটা চিনতে পারল না। সুদর্শন এক যুবক, পরনে জিনসের ট্রাউজার, মাথাভর্তি এলোমেলো কালো চুল, কাকের বাসা বললেই হয়। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার হাবভাব পরিচিত লাগল পিকেরিঙের। ছদ্মবেশ নিয়ে আছে, কিন্তু রানাই। মুন রক দেখার জন্যে লাইনে দাঁড়াল ও। ক্যামেরার ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে আবার তাকাল পিকেরিং। না, আর কোন সন্দেহ নেই।

পিকেরিঙের ভেতর থেকে খুশির ফোয়ারা উথলে উঠল। রেইলের কাছে থেকে পিছিয়ে এল সে। কিন্তু রানার সাথে

যোগাযোগ করার জন্যে নিচে নামল না।

অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে উঠল রানা। আরও কিছুক্ষণ দেখল সে, কিন্তু পিকেরিং যোগাযোগ করল না। বাইরে কালো হয়ে আসছে আকাশ। এতক্ষণে ঘড়ি দেখল রানা। সোয়া আটটা বাজে। নাহ, আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না। মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এল ও।

বিল্ডিঙের পিছনের রাস্তায় রেখে যাওয়া গাড়িটা দূর থেকেই দেখতে পেল রানা। গাড়িতে বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। সিগারেট ধরাল একটা। তারপর আপনমনে কাঁধ ঝাঁকিয়ে স্টার্ট দিল, রওনা হলো পুব দিকে।

ওর বাঁ দিকে পড়ল ক্যাপিটল, প্রায় অন্ধকার আকাশের গায়ে উঁচু গ'ুজটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। হাউজ অফিস বিল্ডিং পেরিয়ে এসে ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি, ফিরে যাচ্ছে ক্যাপিটল হিলে ভাড়া করা গ্রাউণ্ড ফ্লোর অ্যাপার্টমেণ্টে।

আকাশ কালো হতে শুরু করলেও, কোথাও মেঘ নেই, অনেকগুলো তারা পিটপিট করে জ্বলছে। আবহাওয়ার রিপোর্ট ভালই, কাল দিনটা শুকনো খটখটে থাকবে। পিকনিকের জন্যে চমৎকার একটা দিন।

কিন্তু সে কালকের কথা।

বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে ডাডিংটন প্লেসে ঢুকল গাড়ি। ফুটপাথের পাশে থামল রানা। সার সার বাড়ি, বাড়ির সামনে গাছপালা, লাইটপোস্টের হলুদাভ আলোয় সুন্দর দেখাচ্ছে চারদিক। গাড়িতে তালা লাগাল রানা, কটা ধাপ টপকে সামনের দরজায় দাঁড়াল। তারপর ঘুরল ও।

রাস্তায় কেউ নেই। একটা বিড়াল পর্যন্ত না।

তালা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

স্বামীর দিকে তাকালেন পামেলা কনওয়ে, তারপর কামরার আরেক প্রান্তে বসা জেফ রিকার্ডের দিকে ফিরলেন। 'তোমার কি সত্যি মনে হয়, এতে কাজ হবে?' প্রশ্ন করলেন তিনি।

হোয়াইট হাউসের ওপরতলায় রয়েছেন ওঁরা, লিংকন সিটিং রূমে। ছোট কামরা, রুচি স্নিগ্ধ আসবাবে সাজানো, পর্দা আর দেয়াল একই রঙের। লিংকন পরিবারের যদি নাও হয়, রোজ উডের তৈরি চেয়ারগুলো লিংকন আমলের তো বটেই।

একটা চেয়ারে প্রায় শুয়ে আছেন জেফ রিকার্ড, তাঁর তুলনায় চেয়ারটা আকারে ছোট হওয়ায় ঢাকা পড়ে গেছে সেটা। পামেলার দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে রিচার্ড কনওয়ের দিকে তাকালেন তিনি, তারপর আবার পামেলার দিকে ফিরলেন। বাঁ দিকের কাঁধটা একটু উঁচু করলেন তিনি। 'রানা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলার উপায় নেই,' নিস্তব্ধতা ভাঙলেন তিনি। 'ইতিমধ্যে যা বলেছি আরেকবার তোমাদের শোনাতে পারি। আমার ধারণা–স্রেফ ধারণা–টিউলিপকে রানা বাড়ি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পামেলা কনওয়ে। 'ভাল হত যদি জানতাম...'

'তা হত বৈকি। কিন্তু পরিষ্কারভাবে কিছু জানার উপায় কোথায়? যা ঘটছে তার ওপর চোখ রেখে হিসেব মেলাতে হবে। প্রশ্ন হলো, টিউলিপকে রানা সাথে করে রাখবে কেন? কেন সে ঝুঁকিটা নিতে যাবে? টিউলিপ সাথে না থাকলে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যেতে পারে সে। সেক্ষেত্রে তাকে হয়তো আর কোনদিনই আমরা খুঁজে বের করতে পারব না। কিন্তু টিউলিপ সাথে থাকলে?' কাধ ঝাঁকালেন জেফ রিকার্ড, প্রশ্নের উত্তর সবাইকে আন্দাজ করে নেয়ার সুযোগ দিলেন।

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন পামেলা। তিনিও আশা করছেন,

কিন্তু বিশ্বাস রাখতে পারছেন না।

'আরও একটা ব্যাপার,' আবার মুখ খুললেন, সি.আই.এ. চীফ। 'রানার জন্যে এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তাই না? যা কারও কল্পনায় আসে না, সে-ধরনের কাজ করতে ভালবাসে রানা। তার অতীত ইতিহাস অন্তত তাই বলে। হোয়াইট হাউসে টিউলিপকে ফিরিয়ে আনা সে-ধরনের একটা কাজ। শুধু ফিরিয়ে আনা নয়, টিউলিপকে তার মা-বাবার হাতে তুলে দিয়ে নিজের প্রাণ নিয়ে পালানো।'

'কিন্তু দুটোই অসম্ভব...।'

পামেলাকে থামিয়ে দিয়ে জেফ রিকার্ড বলে উঠলেন, 'আমিও তো ঠিক তাই বলতে চাইছি। অসম্ভব। আর অসম্ভব বলেই এই কাজ করবে রানা। কাজেই, আমরা তার জন্যে অপেক্ষা করব।'

পামেলা তার হাতের কাগজটার দিকে তাকালেন। অতিথিদের তালিকা। 'এদের মধ্যে কে হবে বলে তোমার ধারণা?'

'আন্দাজ করা অসম্ভব। স্পীকার? একজন কেবিনেট সেক্রেটারি?'

'সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত?' জানালার দিকে পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। সাউথ লনের সামনে, ওয়াশিংটন মনুমেন্টের চারধারে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, সেই আলোর আভা লাগল তাঁর মুখের একদিকে। ঘরের মৃদু আলো পড়েছে তাঁর মুখের আরেক দিকে।

চোখ তুলে বন্ধুর দিকে তাকালেন জেফ রিকার্ড। 'সে যদি তোমার ছদ্মবেশ নিয়ে আসে, তাতেও আমি আশ্চর্য হব না, রিচার্ড।'

'কোন মানুষ এত দক্ষ হয় কি করে?' পামেলা কনওয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

'আমার ধারণা সত্যি হলে সেটা তুমি নিজের চোখেই দেখতে

পাবে,' বললেন পারিবারিক বন্ধু জেফ রিকার্ড।

ওঁদের দু'জনের দিকেই কটমট করে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'সে কতটা দক্ষ আমি জানতে চাই না। আমি চাই রানা ধরা পড়ুক। প্রথমে আমি টিউলিপকে ফিরে চাই, তারপর রানাকে। সবশেষে, যদি সম্ভব হয়, হেনরি পিকেরিংকে। রানা…টিউলিপকে ফিরিয়ে আনলেই তার অপরাধ মাফ হয়ে যাবে না। তাকে ধরতে হবে। কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। আমি চাই তার যাবজ্জীবন হোক।'

বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে জেফ রিকার্ড বললেন, 'তুমি হয়তো ভাবছ আবার মৃত্যুদণ্ড চালু করা গেলে মন্দ হত না, তাই কি?'

কিন্তু রিচার্ড কনওয়ে কৌতুক বোধ করলেন না। 'লোকটা কিডন্যাপার। একজন খুনী। রাশিয়ার একজন গুপ্তচরও হতে পারে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন জেফ রিকার্ড। 'এখানে তোমার ভুল হচ্ছে। মাসুদ রানা যেমন সি.আই.এ-র স্পাই নয়, তেমনি কে.জি.বি-রও স্পাই নয়। এ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি।'

'সে ধরা পড়বে এই গ্যারান্টি দিতে পারো না?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

একমুহূর্ত চুপ করে থাকলেন জেফ রিকার্ড। তারপর বললেন, 'পারি। রানা ধরা পড়বে। তোমার কাছে এই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম।'

রাত প্রায় দুটোর দিকে বাইরে থেকে রানার ঘরের জানালা খোলার চেষ্টা করল পিকেরিং। ফ্রেমের চারদিকে আলতোভাবে আঙুল বুলাল সে, লুকানো তার আছে কিনা দেখছে।

আছে তার, অন্তত দুই সিস্টেমের দুটো, বেশিও হতে পারে।

যার নাম মাসুদ রানা, ভাবল পিকেরিং, প্রতিটা মুহূর্ত সতর্ক থাকে বানচোত। নিশ্চয় ভেতর দিকেও আরেক প্রস্থ তার আছে। সবগুলো তার নাগালের মধ্যে পেলেও, কেটে ফেলা বা খুলে নেয়া সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা ছাড়া উপায় নেই।

জানালার কাছ থেকে পিছিয়ে এল পিকেরিং। অন্ধকারে ঘুরল। তারপর নিঃশব্দে পা বাড়াল বেসমেণ্ট দরজার দিকে।

একটা ঝাঁকি খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল রানার।

ঘরের ভেতর ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটাই জানালা, বন্ধ থাকার কথা। সেদিক থেকে কোন শব্দ এল না। শুধু রানার কানে খুদে একটা প্লাগ মৃদু শোঁ শোঁ আওয়াজ করছে। তারমানে জানালাটা এখন আর বন্ধ নয়।

স্থির হয়ে শুয়ে থাকল রানা, জানালার দিকে পিঠ। শ্বাসপ্রশ্বাসে কোন পরিবর্তন ঘটল না, যেমন বইছিল তেমনি বইতে লাগল–ধীর ভাবে, নিয়মিত–একজন ঘুমন্ত লোক যেভাবে শ্বাস ফেলে আর নেয়। শুধু চোখ দুটো ঘুরল রানার, বিছানার পাশে টেবিলের ওপর রাখা ঘড়িটা নেই। আছে নিশ্চয়, কিন্তু লিউমিনাস ডায়াল নিভে গেছে। তারমানে বিদ্যুৎ নেই। মেইন সুইচ অফ করে দিয়েছে কেউ।

বাড়ির ইলেকট্রিকাল সার্কিটে চারটে অ্যালার্ম সিস্টেম সেট করেছিল রানা। সবগুলোই অকেজো করে দেয়া হয়েছে। ফিউজ বক্সটা বেসমেণ্টে। বিদ্যুৎ সরবরাহ সেখান থেকে বন্ধ করা হয়েছে।

যান্ত্রিক গোলযোগের ওপর হাত নেই। তাছাড়া অপরাধপ্রবণ মানুষের ওপরও বিশ্বাস নেই। বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটতে পারে, এ রানা আগেই আশঙ্কা করেছিল। সে-কথা ভেবেই আরও একটা ব্যবস্থা করা আছে ওর, এমনকি প্রফেশনাল কারও চোখেও ধরা

পড়বে না। জানালার ফ্রেমে, গোড়ার দিকে, ব্যাটারিচালিত একটা অ্যালার্ম, সামান্য নড়াচড়াতেই জ্যান্ত হয়ে উঠবে।

সতর্ক সঙ্কেত, তার বেশি কিছু না। তবে যথেষ্ট।

শুধু হাতটা নাড়ল রানা, বালিশের তলায় সুইচে আঙুল ঠেকাল। তারপর রিভলভারের ওপর হাত পড়তেই পিছন থেকে কর্কশ গলায় নির্দেশ এল, 'নড়বে না, রানা। আমার হাতে পিস্তল।'

পিকেরিং।

রানা নড়ল না।

পিছনে একটা টর্চ জ্বলে উঠল। 'এবার এদিকে ফেরো। ধীরে ধীরে।'

ধীরে ধীরে পাশ ফিরতে শুরু করে বিছানায় পিঠ দিল রানা। ডান হাতের কনুই দিয়ে চোখ ঢাকল, উজ্জ্বল আলো সহ্য হলো না। কনুইয়ের আড়াল থেকে চোখ পিট পিট করে তাকাল ও। টর্চের পিছনে কিছু দেখা গেল না, অন্ধকার। ক্ষীণ একটু তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে।

'বাঁ হাতটাও বের করো, রানা,' বলল পিকেরিং। 'সাবধান। কোন রকম চালাকি করতে যেয়ো না।'

রিভলভারটা ছেড়ে দিয়ে চাদরের তলা থেকে হাতটা বের করে আনল রানা। পিস্তলের মুখে আর কিই বা করতে পারে ও?

'মেয়েটা কোথায়?'

'তোমারটা আসলে ওয়ান-ট্র্যাক মাইণ্ড,' বলল রানা। 'বড় মেয়ে ঘেঁষা লোক, বাবা! দেখা হলেই শুধু মেয়েটা কোথায়, মেয়েটা কোথায়। আর বুঝি কিছু ভাবতে পারো না তুমি?'

'কোথায় মেয়েটা?'

'নেই। অন্তত এখানে নেই। এমনকি ওয়াশিংটনেও তাকে আমি রাখিনি।'

'বলবে না?'

রানা উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না।

কয়েক সেকেণ্ড আর কিছু বলল না পিকেরিংও। ঘরের চারদিকে টর্চের আলো ফেলল সে। এতক্ষণে তার মুখ দেখার সুযোগ হলো রানার। ছায়া পড়ায় ভাঙাচোরা লাগল চেহারা।

'ভেবেছ তোমার কথা আমি বিশ্বাস করব?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'যা খুশি বিশ্বাস করতে পারো তুমি। আমার কি!'

হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ শোনা গেল। উল্টোদিকের দরজার ওদিক থেকে এল আওয়াজটা। কোমল একটা গোঙানির মত আওয়াজ। চট করে একবার সেদিকে তাকিয়েই দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল রানা। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

নিস্তব্ধ বাড়ি, গভীর রাত, ঘুমন্ত শিশুর কোমল গোঙানির আওয়াজ—কালা না হলে যে-কেউ শুনতে পাবে। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হলো পিকেরিঙের চেহারা। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা। রানার দিকে তাক করা থাকল পিস্তল আর দৃষ্টি, পিছাতে শুরু করল সে।

বিছানার ওপর উঠে বসার চেষ্টা করল রানা। উদ্‌ভ্রান্ত দেখাল ওকে। 'ওদিকে যেয়ো না!'

'খবরদার!' দাঁড়িয়ে পড়ে গর্জে উঠল পিকেরিং।

পিকেরিং গুলি করতে যাচ্ছে দেখে আবার শুয়ে পড়ল রানা।

পিকেরিঙের পিস্তল ধরা হাতে ঢিল পড়ল। আবার পিছাতে লাগল সে। এক পা এক পা করে।

রাগে আর হতাশায় নিঃশব্দে ছটফট করছে রানার চোখ জোড়া। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ও। এই মুহূর্তে আর কিছু করার নেই ওর।

দরজার পাশে পিঠ ঠেকল পিকেরিঙের। নিরেট ওক কাঠের

কবাট, তামার চকচকে নব। একশো বছরের পুরানো বাড়ি। তারপর, মুহূর্তের জন্যে, রানার ওপর থেকে তার দৃষ্টি সরে গেল।

চাদরের তলায় ঢুকে গেল রানার হাত। 'তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি...'

'চোপ শালা!' গর্জে উঠল পিকেরিং। 'হাত বের কর!'

চাদরের তলা থেকে খালি হাতটা বের করল রানা।

টর্চটা পিস্তল ধরা হাতে নিল পিকেরিং, তারপর বগলের নিচে ঢোকাল সেটা, আলোটা এখনও রানার দিকে তাক করা থাকল। এবার সে তার মুক্ত হাতটা বাড়াল নব ধরার জন্যে।

কাছে পৌঁছল, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি হলো না। নব আর হাতের মাঝখানে চুল পরিমাণ দূরত্ব থাকল, সংযোগ ঘটতে সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ বাকি, এই সময় দৈত্যাকার একটা স্ফুলিঙ্গ মুক্তি পেল। ঘন নীল আগুনের স্বচ্ছ একটা শিখা। অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল, বিদ্যুৎ শক্তির ৪৪,০০০ ভোল্ট পিকেরিঙের হাত বেয়ে ছড়িয়ে পড়ল সারা শরীরে।

অসম্পূর্ণ একটা আওয়াজ বেরুল তার মুখ থেকে। গোঙানির মত, তেমন জোরাল নয়, শুরু হতে না হতেই থেমে গেল। খিঁচ্ ধরে গেল শরীরে। খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মাথার সব চুল। তারপরই অদৃশ্য হলো নীল আলোর প্রবাহ, থেমে গেল গুঞ্জন ধ্বনি। মেঝেতে পড়ে গেল পিকেরিং।

আধ মাইল দূরে ক্যাপিটল গম্বুজের উজ্জ্বল আলো দু'চারবার কেঁপে উঠে ম্লান হয়ে গেল। মাঝখানের বাকি সব আলো নিভে গেল। রেডিও-টিভি চলছে না, লাইটপোস্টে আলো নেই। গোটা এলাকা ঢাকা পড়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে। পাওয়ার শর্ট-সার্কিট।

বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নামল রানা, লম্বা তিন পা ফেলে পিকেরিঙের সামনে এসে হাঁটু গেড়ে বসল। একটা হাত তুলে লোকটার বুকে চাপড় মারল ও। তারপর বুকে কান ঠেকাল।

কোন আওয়াজ নেই। বুকটা আবার চাপড়াল রানা। এবার হার্টবিট শোনা গেল। বেঁচে আছে পিকেরিং, কিন্তু জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে।

দরজার সামনে পাপোশের ওপর বসল রানা। আর্থিং-এর জন্যে পাপোশটা ভিজিয়ে রেখেছিল ও। হাত দিয়ে দেখল, ভেজা ভেজা লাগছে, তার বেশি কিছু না–পিকেরিং ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেনি।

তামার নব থেকে একটা তার নেমে এসে ঢুকে গেছে পাপোশের ভেতর। দ্বিতীয় একটা তার বেরিয়েছে বাইরের দরজার কাছে, দরজার নিচ দিয়ে এগিয়ে গেছে উঠানের কিনারা ঘেঁষে একটা ম্যানহোলের দিকে। তারটাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ড মেইন পাওয়ার লাইনের সাথে টেপ দিয়ে আটকে রেখে এসেছিল রানা।

এখন আর সাবধান হওয়ার দরকার নেই, পাওয়ার লাইন অফ হয়ে গেছে। এক প্রস্থ তার উদ্ধার করল রানা, সেটা দিয়ে বাঁধল পিকেরিংকে। এবার দাঁড়াল ও, তামার নবটা ছুঁলো। চাপ দিতেই খুলল সেটা। চৌকাঠ পেরিয়ে পাশের ঘরে এল ও। বেঘোরে ঘুমাচ্ছে টিউলিপ।

শেষ ইঞ্জেকশনটা মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দিয়েছে রানা, জানত যা-ই ঘটুক না কেন, টিউলিপের ঘুম ভাঙবে না।

টিউলিপের বিছানার পাশে টেবিলের ওপর একটা টেপ রেকর্ডার রয়েছে। সুইচটা পাশের ঘরে, রানার বালিশের তলায়। এখনও ঘুরছে টেপ, তবে আর কোন আওয়াজ বেরোবে না। একমাত্র যে আওয়াজটা হবার কথা তা খানিক আগেই হয়ে গেছে–কোমল একটা গোঙানির শব্দ। ওই শব্দটাই এ-ঘরের দরজার কাছে টেনে এনেছিল পিকেরিংকে।

তেরো

ধনুকের মত বাঁকা হয়ে নেমে এসেছে সিঁড়িটা। পরিচিত সিঁড়ি, তবু হোয়াইট হাউসের ঝুল-বারান্দা থেকে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নামার সময় কেমন যেন দিশেহারা বোধ করলেন পামেলা কনওয়ে। মন ভাল নেই, নাকি শরীরও খারাপ? নিচে প্রচুর লোকজন, বেশিরভাগই তাঁর পরিচিত, অথচ কয়েক মুহূর্ত তাদের কাউকেই তিনি চিনতে পারলেন না। মাসুদ রানা নামে কিডন্যাপার লোকটা কি এদের মধ্যে আছে? যদি থাকে, কোথায় সে? কে সে? তাকে চেনার কি কোন উপায় নেই?

আছে! তার সাথে টিউলিপ থাকবে!

সত্যিই কি থাকবে? সত্যিই কি টিউলিপকে ফিরিয়ে দেবে লোকটা? একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন তিনি। মাথার ভেতর কত রকম দুশ্চিন্তা আনাগোনা করছে। জেফ হয়তো নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে আশ্বাসবাণী শুনিয়েছে তাঁদের। টিউলিপ হয়তো... অনেক কষ্টে চিন্তার লাগাম টেনে ধরলেন তিনি।

ভিড়ের মধ্যে স্বামীকে দেখতে পেলেন পামেলা। পুরানো বন্ধুদের সাথে গল্প করছেন প্রেসিডেন্ট, পুরুষ আর মহিলারা ঘিরে

আছে তাঁকে, এরা সবাই তাঁর সেই কংগ্রেসে থাকাকালীন সুহৃদ।

রঙিন পর্দার ফাঁক দিয়ে ফালি ফালি রোদ ঢুকছে ভেতরে। হোয়াইট হাউস কর্মীরা সাদা জ্যাকেট পরে হট ডগস, হ্যামবার্গার, আইসক্রীম, আর কটন ক্যাণ্ডি পরিবেশন করছে। চারদিকে কচি কচি ছেলে-মেয়েদের ভিড়। কংগ্রেস সদস্য আর সিনেটরদের সন্তান ওরা, পিকনিকে এসেছে। কেউ কেউ বাবা-মার গায়ের সাথে সেঁটে আছে, বেশিরভাগই দৌড়াদৌড়ি করছে লনের ওপর—গাছে চড়ছে, লুকোচুরি খেলছে, ফোয়ারার কাছে সফট বল খেলছে।

বাচ্চাদের দেখতে দেখতে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল পামেলা কনওয়ের। সবাই আছে, শুধু নিজের বাচ্চাটা এখানে নেই।

চারদিকে হাসি-আনন্দ, উৎসব-উৎসব ভাব। ছোঁয়াচে। উঁচু মঞ্চের স্কয়্যার ডান্সাররা এইমাত্র একটা অনুষ্ঠান শেষ করে নতুন আরেকটা ধরল। সংগীতের তালে তালে খোকা-খুকিরা মার্চ করে গেল লনের এক দিক থেকে আরেক দিকে। আবার তারা ফিরে আসছে। তাদের সাথে ভিড়ে গেল পামেলার পরিচিত একজন সিনেটর, বয়স আশির ওপর। নিজের অজান্তেই হেসে ফেললেন পামেলা। আরেক মঞ্চে যাদু খেলা দেখানো হচ্ছে। খালি তালু থেকে রঙচঙে মাছ বের করছে যাদুকর, একের পর এক অনেকগুলো। আরেক দিকে পুতুল নাচের আসর বসেছে। ক্লাউনরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কিম্ভূতকিমাকার চেহারা নিয়ে। চারদিকে আরেকবার চোখ বুলিয়ে পামেলা আন্দাজ করলেন, অতিথিদের সংখ্যা হাজার না ছাড়ালেও, কাছাকাছি হবে।

স্বামীর সাথে পামেলাও কংগ্রেস সদস্যা ছিলেন। ওঁরা চলে আসার পর কংগ্রেস অনেক বদলে গেছে। চারদিকে এমন অনেক মুখ ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের তিনি চেনেন না। ওদের মধ্যে কে

অতিথি কে সিকিউরিটি গার্ড তাও বোঝার কোন উপায় নেই।

এদের মধ্যে কেউ একজন মাসুদ রানা? সে কি সত্যি এসেছে? নাকি এখনও পৌঁছায়নি, তবে আসবে?

টিউলিপকে অন্য কোথাও যদি রেখে আসে?

তাঁর মাথা ঘুরে উঠল। নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করলেন তিনি। আচ্ছন্ন ভাবটা একটু পরই কেটে গেল। ভাবলেন, জেফের প্ল্যান সফল হতেও পারে, নাও পারে। প্ল্যানটা মোটামুটি মন্দ না। বড় একটা পিকনিকের আয়োজন করা, রানা যাতে অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার সুযোগটা নেয়। সে যদি টিউলিপকে ফিরিয়ে দিতে চায়, তবেই আসবে, তাই না? প্ল্যানটা জেফের, আয়োজনটাও তার। পিকনিক হবে হোয়াইট হাউসের লনে, নিরাপত্তার ব্যবস্থা হবে নামমাত্র। নিমন্ত্রণ পাবে শুধু কংগ্রেস আর সিনেটর পরিবারগুলো। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা থাকবে, ছেলেমেয়েদের অবশ্যই সাথে আনতে হবে।

শর্তটা রানার জন্যেও প্রযোজ্য।

তবে জেফ কোন গ্যারান্টি দেয়নি। সম্ভাবনা আছে ফাঁদে পা দিতে পারে রানা, তার বেশি কিছু না।

চিন্তায় ছেদ পড়ল, পামেলা দেখলেন সপরিবারে একজন সিনেটর তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করলেন তিনি। হাসলেন জোর করে।

কেউ জানে না টিউলিপ কিডন্যাপ হয়েছে। সম্পূর্ণ শান্ত আর স্বাভাবিক থাকতে হবে তাঁকে। সবার সাথে কথা বলতে হবে। হাসতে হবে। সবার সাথে বসে খেতে হবে।

কেন? আমার মেয়ের কোন খবর নেই, আমি কেন হাসব?

'হাই!' সিনেটরের স্ত্রী জড়িয়ে ধরলেন পামেলাকে।

'হাই!' সাড়া দিয়ে বান্ধবীর উÌ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করলেন ফার্স্ট লেডি। হাসছেন তিনি। কুশলাদি জানতে

চাইছেন।

জোর করে হাসলেও, তার একটা প্রতিক্রিয়া আছে। হঠাৎ করেই পামেলা কনওয়ের মনে হলো, প্ল্যানটা সফল হবে। আসবে রানা। মেয়েকে আবার ফিরে পাবেন তিনি।

সিনেটর তার ছোট্ট দল নিয়ে আরেক দিকে সরে গেল। স্বামীর দিকে তাকালেন পামেলা। প্রেসিডেন্ট কাছাকাছিই রয়েছেন, তবে তাঁর দিকে পিছন ফিরে। পামেলা জানেন, এই ভিড়ের মধ্যে স্বামী তাঁকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না, তবু তাঁর পাশে থাকতে ইচ্ছে করল। আর কিছু না হোক, চোখের দৃষ্টি, হাতের একটু চাপ, এ-সবও এখন পরম শান্তি এনে দেবে তাঁর মনে। এ-সব এখন তাঁর দরকার। জানেন, তাঁর স্বামীও এ-সবের জন্যে কাঙাল হয়ে আছেন।

কিন্তু এত কাছে, তবু যেন দু'জনের মধ্যে এক সাগর ব্যবধান। এদিক ওদিক থেকে ডাক এসে তাঁকে থামিয়ে দিল, একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে হলো। স্বামীর সামনে দাঁড়াবার সুযোগ পাওয়া গেল না।

ওয়েজ অ্যাণ্ড মীনস চেয়ারম্যান তাঁর পথ আগলে ধরল, বাধ্য হয়ে তার স্ত্রীর সাথে করমর্দন করলেন পামেলা। বাড়িয়ে দেয়া আরেকজনের হাত নিজের হাতে নিতে হলো।

'তারপর বলুন,' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল একজন। 'আপনার মেয়েকে যে দেখছি না? কেমন আছে সে?'

পামেলা মিষ্টি করে হাসলেন। 'ভাল আছে।'

'ভাল আছে?' সাথে সাথে আরেকজন প্রশ্ন ছুঁড়ল। 'কিন্তু কোথায় যেন পড়লাম টিউলিপ অসুস্থ?'

'হ্যাঁ, মানে...'

'সিরিয়াস কিছু না, কি বলেন?' তৃতীয় কণ্ঠস্বর।

স্বামীকে খুঁজলেন পামেলা, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে এখন আর

তাঁকে দেখতে পেলেন না। মনে হলো খোলা লনে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন তিনি। আতঙ্কবোধটা আবার ফিরে আসতে শুরু করল মনে। 'টিউলিপ ভাল আছে। সত্যি। আগের চেয়ে অনেক ভাল।'

সম্ভবত পামেলার কথা বলার ধরনেই সহানুভূতি-মাখা হাসি হাসি মুখগুলোয় কেমন যেন আড়ষ্ট ভাব ফুটল। তাঁর মনে হলো, এরা সবাই তাঁর শত্রু, তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছে।

'বাড়ি থেকে দূরে অথচ অসুস্থ, আহা বেচারি,' অচেনা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন পামেলা। 'নিশ্চয়ই মায়ের জন্যে তার মন খুব খারাপ হয়ে আছে।'

'খাঁটি কথা। অসুস্থ বাচ্চা তোমাকে কাছে চাইবেই।'

'আপনারও নিশ্চয়ই কিছু ভাল লাগছে না?'

'কার লাগে, বলুন? কিন্তু যাই কিভাবে, এখানেও যে আমাকে দরকার,' বলে ওদের দিকে পিছন ফিরলেন পামেলা। কোন কারণ নেই, অথচ সবার ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো তাঁর। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে আসতে চাইল, অনেক কষ্টে ঠেকালেন। আরেক দল অতিথি তাঁর সামনে দাঁড়াল। জোর করে হাসতে হাসতে চোয়াল ব্যথা করছে। চোয়ালের ভেতর মাংস কাঁপছে। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছেন তিনি। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলেন, এভাবে আর আমি হাসতে পারব না!

তবু হাসতে হবে। হাসলেন। ঘিরে থাকা লোকজনের দিকে ক্ষমাপ্রার্থনার দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। পুরানো কৌশলটা ব্যবহার করলেন। 'দুঃখিত। রিচার্ডের সাথে জরুরী কথা বলতে হবে আমাকে।'

সাথে সাথে ভিড় ফাঁক হয়ে গেল। স্বামীকে দেখতে পেলেন পামেলা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, তিনিও স্ত্রীকে দেখতে পেলেন। হাসলেন তিনি, একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন।

হন হন করে স্বামীর কাছে চলে এলেন পামেলা।

'তোমাকে আমি খুঁজছিলাম,' বললেন রিচার্ড কনওয়ে। একটা হাত দিয়ে স্ত্রীর কোমর পেঁচিয়ে ধরলেন তিনি। নরম একটু চাপ, কথার চেয়ে বেশি সান্ত্বনাদায়ক। 'লিজা আর রিপনকে তোমার মনে পড়ে?'

পামেলার পেশীতে ঢিল পড়ল, সুস্থ বোধ করলেন তিনি। কংগ্রেস সদস্য আর তার স্ত্রীর দিকে তাকালেন। মহিলা একটা পত্রিকার সম্পাদিকা। ওদের দু'জনকেই তাঁর ভাল লাগে। 'হ্যাঁ, অবশ্যই—কি যে বলো! হাউ আর ইউ?'

আলাপ শুরু হলো।

কথা বলার ফাঁকে এক সময় পামেলা লক্ষ করলেন, আইসক্রীম তাঁবুর কাছে একজন ক্লাউন দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে ঘিরে আছে পনেরো বিশজন শিশু-কিশোর। ক্লাউনের নামটা তিনি জানেন না, শুধু চেহারায় চেনেন। এই একই পোশাক পরে আগেও হোয়াইট হাউস পিকনিকে এসেছে লোকটা। গাঢ় কমলা রঙের চুল—রঙ করা। লাল স্যুট। দুধের মত সাদা মুখ—পেইন্ট করা, অবশ্যই। নাকটা টকটকে লাল। তাকে ঘিরে থাকা বাচ্চাগুলোর দিকে তাকালেন পামেলা। এক এক করে সবগুলো মুখ দেখলেন। হেসে ফেললেন তিনি।

শিশু-কিশোরের দলটা ক্লাউনের সাথে নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গি করে চারপাশের দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছে।

হঠাৎ দপ্ করে নিভে গেল হাসি। হায়, ওদের মধ্যে তাঁর নিজের মেয়েটা যদি থাকত! একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আবার তিনি আলোচনায় যোগ দিলেন। নতুন কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব জুটল।

কমলা রঙের চুল নিয়ে ক্লাউন লোকটা যেখানে ছিল সেখানেই থাকল, আইসক্রীম তাঁবুর কাছাকাছি, পামেলা কনওয়ের চোখের কোণে। খানিক পর তার দিকে আরেকবার তাকালেন তিনি। শিশু-কিশোরদের দলটা আগের চেয়ে আরও বড় হয়েছে। এই

প্রথম তাঁর চোখে পড়ল, বাচ্চাদের ভিড়ের মাঝখানে আরও একজন ক্লাউন রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ট্র্যাম্প ক্লাউন–কালো টুকরো কাপড় দিয়ে তৈরি স্যুট পরনে, এক রঙা মুখে বড় বড় বহুবর্ণের চোখ আঁকা। দূর থেকে ঠিক বুঝতে পারা গেল না, ক্লাউন মুখোশ পরে আছে, নাকি সত্যি সত্যি রঙ মেখেছে মুখে। এ-ও পরিচিত একটা দৃশ্য, তবে এই ক্লাউনকে আগে তিনি দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। কিন্তু আইডিয়াটা চমৎকার। ট্র্যাম্প ক্লাউন একটা বামন।

পামেলা বড় ক্লাউনের দিকে তাকালেন। দু'জনের চোখাচোখি হলো। ক্লাউনের রঙ মাখা চেহারায় কোন ভাব ফুটলেও বোঝার উপায় নেই। তবে তার হাত নড়ে উঠল। বামন ক্লাউনের কাঁধ ছুঁলো সে। হাস্যকর, বেমানান লাগল বামনটাকে। কাঁধে স্পর্শ পেয়ে মুখ তুলে বড় ক্লাউনের দিকে তাকাল সে। তারপর ওস্তাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল পামেলা কনওয়ের দিকে।

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল বামন। তারপর অকস্মাৎ ওপর দিকে লাফ দিল সে। খিলখিল করে হেসে উঠল ছেলেমেয়ের দল।

বামন লাফাচ্ছে, ছুটছে। লাফাতে লাফাতে এদিকে আসছে।

একটু যেন থতমত খেয়ে গেলেন পামেলা কনওয়ে। এত ছোট একটা শরীর, দেখলে মায়া হয়। আহা বেচারির মনে কত দুঃখ! কিন্তু এত কি আনন্দের ঘটল যে হঠাৎ এমন লাফাচ্ছে? এদিকেই বা আসছে কেন? এদিকে আসছে, তাঁর দিকে?

তারপর সমবেত অতিথিদের গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠল একটা মধুর শব্দ।

'মা!'

সত্য উন্মোচিত হবার মুহূর্তে গলায় দম আটকে এল পামেলা

কনওয়ের। এখনও তাঁর বিশ্বাস করতে ভয় লাগছে। রঙচঙে মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। অপরিচিত পোশাকের ভেতর পরিচিত নড়াচড়া!

হঠাৎ সব ভুলে গেলেন পামেলা কনওয়ে।

লনের ওপর হাঁটু ঠেকালেন তিনি। বাহু দুটো বাড়িয়ে দিলেন সামনে। চিরন্তন একটা ভঙ্গি—বাহুডোরে ফিরে আসার জন্যে সন্তানের প্রতি মায়ের ব্যাকুল আহ্বান।

টিউলিপ! ও টিউলিপ!

পিছু হটল ভিড়। প্রতিটি মানুষ যেন স্তব্ধ পাথরের মূর্তি। কিন্তু এ-সব দিকে কোন খেয়ালই নেই পামেলা কনওয়ের। তিনি পাগলের মত হাসছেন। তাঁর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রাণপ্রিয় সন্তান। ওকে তিনি বাহুবন্ধনে আটকালেন। অস্থির করে তুললেন আদরে আদরে। চোখের পানিতে ভিজিয়ে দিলেন মেয়ের রঙ করা মুখ।

'মা, আমার লাগছে!' হাঁস ফাঁস করে উঠল টিউলিপ।

চমকে উঠলেন পামেলা। উপলব্ধি করলেন, এতক্ষণ তিনি বুকের সাথে পিষছিলেন মেয়েকে। এখনও তাঁর ভয়, কেউ বুঝি আবার তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে টিউলিপকে।

রিচার্ড কনওয়েও ছুটে এসেছেন। স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে তাঁরও কোন খেয়াল নেই। স্ত্রী এবং কন্যাকে জড়িয়ে ধরে আছেন তিনি। চোখ জোড়া চিকচিক করছে, কিন্তু হাসছেন।

দু'হাতে ধরে মেয়ের মুখ একটু উঁচু করলেন পামেলা। টিউলিপের চোখেও পানি, সে পানিতে তার মুখের রঙ এরই মধ্যে মুছে যেতে শুরু করেছে। নিজের মুখের সাথে মেয়ের মুখ আবার তিনি চেপে ধরলেন। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন স্বামীর দিকে। কথা হলো না। শুধু দৃষ্টি বিনিময় হলো। চরম বিজয়। গভীর ভালবাসা। পরম শান্তি।

ওঁদের পাশে দাঁড়িয়ে একজন এজেণ্ট তার মাইক্রোফোনের সুইচ অন করল, তারপর সগর্জনে নির্দেশ দিল একটা। কিন্তু পামেলা কনওয়ে খেয়াল করলেন না। লনের একদিকে সিক্রেট সার্ভিস এজেণ্টরা লাফ দিয়ে তৈরি হলো। আগে থেকে ঠিক করা পজিশনের দিকে ছুটল তারা। কিন্তু এরই মধ্যে দেরি হয়ে গেছে।

ক্লাউন হাওয়া!

রঙিন পর্দার পিছনে দাঁড়াল রানা। ক্লাউন-স্যুট খুলে ফেলেছে, মঞ্চের তলায় ফেলে দিয়ে এসেছে সেটা। স্যুটের সাথে ফেলে দিয়েছে কমলা পরচুলা, লাল নাক, পাতলা রাবার মাস্ক। উপস্থিত আর সব অতিথিদের মত ওর পরনেও এখন অত্যন্ত দামী বিজনেস স্যুট।

ধনুকের মত বাঁকা গাড়ি-পথ ধরে ধীর পায়ে হেঁটে এগোল রানা। সামনেই লোহার গেট। গেট পেরিয়ে যেতে পারলেই স্বাধীনতা।

ওর পিছনে লন থেকে একটা শোরগোল ভেসে এল। ঘাড় ফেরাল রানা, টিউলিপকে তার মায়ের বুকে দেখতে পেল। কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন রিচার্ড কনওয়ে।

পুনর্মিলন।

ওর দায়িত্ব ও পালন করেছে। এবার চাচা আপন পরাণ বাঁচা।

জানে, খুব বেশি সময় পাওয়া যাবে না। গেট আর বেড়ার বাইরে বেরিয়ে যাবার পর ওরা যদি ধাওয়া শুরু করে, চোখে ধুলো দেয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগেই যদি...

গেটের কাছে পৌঁছে গেছে ও। গার্ডদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল। গেট পেরিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বড়সড় একটা বাড়িকে পাশে রেখে এগোল রানা। হোয়াইট

হাউসেরই একটা অংশ এই বাড়ি। সাদা ভ্যান গাড়িটা যেখানে রেখে গিয়েছিল সেখানেই রয়েছে, এটায় চড়েই এসেছে ও।

ঝনাৎ করে আওয়াজ হলো পিছনে। চেইন তুলে দেয়া হলো, বন্ধ হয়ে গেল গেট। ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ। এদিকেই আসছে। পিছন দিকে তাকাল না ও। একজন ক্লাউনকে খুঁজছে ওরা। তল্লাশি চালাবে সাদা ভ্যানে।

হাঁটার গতি একই রকম থাকল। শুধু বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছে।

সামনে একটা বাঁক। বাঁক ঘুরে সেভেনটি৷ স্ট্রীটে পড়ল রানা। যেখানে রেখেছিল সেখানেই রয়েছে ফিয়াট একশো চব্বিশ স্পাইডার–শক্তিশালী ইঞ্জিনসহ ছোট একটা গাড়ি। যানবাহনের ভিড় গলে সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। ছয় ব্লক দূরে আরও একটা গাড়ি রাখা আছে, একটা চার্চের সামনে, চার্চের নিজস্ব পার্কিং এরিয়ায়। শেষ গাড়িটা আছে একটা হাসপাতালের ভেতর, উঠানের একধারে। হাসপাতালটা ওয়াশিংটন সার্কেলের কাছে।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছে রানা। লোকজনের ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল ও। পকেট থেকে স্পাইডারের চাবিটা বের করে হাতে নিল। ফুটপাথ থেকে নামল ও। গাড়িটার পিছন দিক হয়ে ড্রাইভার সাইডে চলে এল। কিন্তু আরও একজন লোক ফুটপাথ থেকে নেমে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে।

গাঢ় রঙের স্যুট পরেছে লোকটা। হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে। ডানহাতে নিশ্চয়ই রিভলভারের বাঁট ধরে আছে। গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। কোন কথা বলল না। রানা ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল।

পিছন থেকে এগিয়ে এল আরও দু'জন।

তারপর কালো একটা গাড়ি ঠিক ওর পাশে এসে থামল। একটা সরকারি লিমুসিন। প্রথমে নামল ড্রাইভার। লিমুসিনের

নাকের সামনে দিয়ে ঘুরে এল সে, দরজা খুলে সরে দাঁড়াল এক পাশে।

লিমুসিনের পিছনে বসা লোকটা মৃদু হাসল। উত্তরে হাসতে পারল না রানা। ওর কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। চোখ জোড়া নিষ্প্রভ।

ধরা পড়ে গেছে রানা। লিমুসিনের পিছনের সীটে বসা ভদ্রলোককে চিনতে পেরেছে ও। জেফ রিকার্ড। সি.আই.এ. চীফ।

চোদ্দো

'ভেতরে ঢুকুন,' জেফ রিকার্ড বললেন।

এক মুহূর্ত নড়ল না রানা। তারপর কথা না বলে গাড়ির ভেতর ঢুকল। সাথে অস্ত্র নেই, তিনজন সশস্ত্র লোকের বিরুদ্ধে একা কি করতে পারে ও?

ড্রাইভারের উদ্দেশে মাথা কাত করলেন সি.আই.এ. চীফ, গাড়িটা আবার যানবাহনের দ্রুতগতি মিছিলে ঢুকে গেল। জেফ রিকার্ড একটা বোতামে চাপ দিলেন, ড্রাইভারের সীটের পিছন থেকে কাঁচের একটা পার্টিশন সিলিং পর্যন্ত উঠে গেল।

দক্ষিণ দিকে ঘুরে কনেকটিকাট এভিনিউয়ে পড়ল লিমুসিন, হোয়াইট হাউস এবং মলের দু'পাশে সরকারি ভবনগুলো অনেক পিছনে ফেলে এসেছে ওরা।

রানা ভাবল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? ল্যাংলিতে?

কাঁচের পার্টিশনের দিকে ইঙ্গিত করলেন জেফ রিকার্ড। ‘সাউণ্ডপ্রুফ,’ বললেন তিনি। ‘আমরা কথা বলতে পারি।’

এক কথায় জানিয়ে দিল রানা, ‘আমার মূড নেই।’

‘তাহলে তো আমাকে একাই কথা বলতে হয়,’ শ্রাগ করলেন সি.আই.এ. চীফ।

ভাল-মন্দ কিছুই বলল না রানা।

‘জানতে ইচ্ছে করছে, মানসিকভাবে নিজেকে আপনি তৈরি করেছেন কিনা,’ বললেন জেফ রিকার্ড। ‘কি ঘটতে যাচ্ছে, আশা করি নিশ্চয় আপনি তা আন্দাজ করতে পারছেন?’

‘দু’জনের আন্দাজ দু’রকম হতে বাধ্য,’ বলল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে ও।

‘আচ্ছা! আপনার বুঝি তাই ধারণা?’ মৃদু হাসলেন জেফ রিকার্ড। ‘ঠিক আছে, আমি কি আন্দাজ করেছি বলি, দেখুন আপনারটার সাথে মেলে কিনা।’ নড়েচড়ে বসলেন তিনি। ‘কিডন্যাপিঙের ম্যাক্সিমাম শাস্তি যাবজ্জীবন। জানি, দুনিয়ার সেরা আইনবিদরা আপনার হয়ে লড়বে। সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত যাবে তারা। কিন্তু অপরাধটা পূর্ব পরিকল্পিত, আর বিস্তর সাক্ষী প্রমাণ থাকায় ম্যাক্সিমাম শাস্তি না দিয়ে বিচারকদের কোন উপায় থাকবে না। রায়ের শেষে তাঁরা শুধু বলবেন, আসামী ক্ষমা ভিক্ষা চাইলে একমাত্র আমেরিকার প্রেসিডেণ্টই শুধু সেটা বিবেচনা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। ঠিক জানি না, আপনি ক্ষমা ভিক্ষা নাও চাইতে পারেন, তবে আপনার পক্ষ থেকে মেজর জেনারেল রাহাত খান, আপনার বস্, অবশ্যই শেষ চেষ্টা করে দেখবেন।

‘কিন্তু প্রেসিডেণ্ট তাঁর আবেদন শুনবেন বলে মনে হয় না, কারণ তাঁরই মেয়েকে কিডন্যাপ করেছিলেন আপনি। ইতিমধ্যে, মামলা চলাকালে, রোমাঞ্চকর কিছু ঘটনা ঘটবে। হ্যাঁ, কমাণ্ডো

স্টাইলে হামলা চালানো হবে আপনাকে পুলিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে। জেলখানায়, কোর্টে আনা-নেয়ার সময়। কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হবে না। মঝখান থেকে শুধু শুধু কিছু লোক অকালে মারা যাবে। তারপর, সাজা ভোগ করার সময়, জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করবেন আপনি। কিন্তু কারারক্ষীদের মনে থাকবে কার মেয়েকে আপনি কিডন্যাপ করেছিলেন, কাজেই আপনার ওপর বিশেষ নজর রাখবে তারা। তারমানে, কোন উপায় নেই, বাকিটা জীবন চোদ্দ শিকের ভেতরই কাটাতে হবে আপনাকে।' জেফ রিকার্ড চুপ করলেন, কয়েক সেকেণ্ড পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিছু বলছেন না যে? মিলল?'

'না,' বলল রানা, এই প্রথম ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল ওর ঠোঁটে। 'মিলল না।'

'তাহলে তো শুনতে হয় আপনি কি আন্দাজ করেছেন,' আগ্রহের সাথে বললেন জেফ রিকার্ড।

'তার আগে একটা প্রশ্ন করি?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনি তো আমার ফাইল পড়েছেন। ওতে এমন কিছু পেয়েছেন নাকি যাতে আমাকে ইডিয়ট বলে মনে হয়? মনে হয়, আমি একটা গর্দভ?'

কেমন একটু থতমত খেয়ে গেলেন জেফ রিকার্ড। 'না...মানে, ঠিক উল্টোটাই বরং মনে...'

'তাহলে কিভাবে ধরে নিলেন নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা না রেখে বাঘের ঘরে ঢুকেছি আমি?' প্রশ্ন করল রানা।

'তারমানে? আপনি জানতেন ধরা পড়ে যাবেন?'

'জানতাম ধরা পড়তে পারি।'

'এবং আপনি বলছেন, নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা আপনার করা আছে?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বলল রানা।

বিস্মিত হলেন জেফ রিকার্ড। 'জানতে পারি, কি সেটা?'

'অবশ্যই জানতে পারেন,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'এবং জানার পরই আমাকে নিয়ে আপনাদের যে প্ল্যান সেটা বাতিল হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, বাতিল করে দিতে বাধ্য হবেন।'

'প্লীজ বলুন, প্লীজ।' সকৌতুকে জানতে চাইলেন সি.আই.এ. চীফ।

'হেনরি পিকেরিং রাশিয়াকে কি কি তথ্য দিয়েছে আমি জানি,' বলল রানা। 'আরও জানি, কি কি ফাইল ল্যাংলি থেকে সরিয়ে গোপন জায়গায় রেখেছে সে, কিন্তু সময় আর সুযোগের অভাবে কে.জি.বি-র হাতে শেষ পর্যন্ত তুলে দিতে পারেনি। ফাইলগুলো কোথায় আছে তা-ও আমি জানি। টপ-সিক্রেট তথ্যগুলো পিকেরিঙের কাছ থেকে পাওয়ার পর কে.জি.বি সেই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে নিজেদের ডিফেন্স সিস্টেমে ব্যাপক রদবদল করে...।'

রানার কথাগুলো গোগ্রাসে গিলছিলেন জেফ রিকার্ড, হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল তাঁর। 'রাশিয়া ডিফেন্স সিস্টেম বদলালে আপনার তা জানার কথা নয়! এসব কিছুই আপনার জানার কথা নয়!'

'নয়। কিন্তু জেনেছি।' হাসল রানা। 'বলতে পারেন সেকেণ্ড হ্যাণ্ড তথ্য। কিন্তু ইচ্ছে করলে আপনারা উৎস থেকেও এ-সব তথ্য আবার সংগ্রহ করতে পারবেন।'

'পিকেরিং? ইয়েস, মাই গড, পিকেরিং!' রানার দিকে ঝুঁকলেন সি.আই.এ. চীফ। 'তারমানে আপনি জানেন কোথায় আছে সে?'

'জানি।'

'কোথায়?'

কথা না বলে মুচকি হাসল রানা।

একটু থেমে জেফ রিকার্ড বললেন, 'আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার আন্দাজটা মিথ্যে ছিল,' অকপটে স্বীকার করলেন তিনি।

'বলুন ভুল ছিল,' সংশোধন করে দিল রানা।

'না,' জেফ রিকার্ড বললেন, 'মিথ্যে ছিল।'

'মানে?'

'আপনাকে আসলে আমি যাচাই করছিলাম,' বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুই আমি আন্দাজ করিনি। আপনার ভবিষ্যৎ কি তা আমি জানি।'

'জানেন!'

'ব্যাপারটা বোধহয় প্রথম থেকেই ব্যাখ্যা করা উচিত, একটা ব্যাখ্যা আপনার পাওনা হয়েছে,' বললেন সি.আই.এ. চীফ। 'পিকনিক। ওটা একটা ফাঁদ ছিল।'

'হ্যাঁ, একটু দেরিতে বুঝেছি।'

'দুঃখিত, কৌশলের আশ্রয় না নিয়ে উপায় ছিল না। আপনার মত পিচ্ছিল মানুষকে আর কিভাবে আটকানো যেত বলুন! খুশি লাগছে এই ভেবে যে ফাঁদটা কাজে দিয়েছে।'

'কংগ্রাচুলেশন্স।'

চোখ থেকে চশমা খুলে কাঁচ দুটো রুমাল দিয়ে মুছলেন জেফ রিকার্ড। 'আমি চাইনি ওখানে ওদের হাতে আপনি ধরা পড় ন। কারণ, প্রেসিডেন্ট চাইছেন একটা ট্রে-তে করে আপনার কল্লাটা তাঁর সামনে রাখা হোক।' আবার চশমা পরলেন তিনি, রানার দিকে তাকালেন। 'কিন্তু আমি আপনাকে অখণ্ড অবস্থায় রাখতেই পছন্দ করব।'

রানা একটা সিগারেট ধরাল। তারপর হঠাৎ ওর খেয়াল হলো: জেফ রিকার্ড কি বললেন? প্রেসিডেন্ট চান ওর শাস্তি হোক,

কিন্তু জেফ রিকার্ড চান না! 'তারমানে?'

'মানে হলো, মাসুদ রানা টিউলিপ কনওয়েকে কিডন্যাপ করতে পারে না। প্রথমে আমারও তাই ধারণা হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি ধারণাটা একদম ভুল।' মুচকি মুচকি হাসছেন জেফ রিকার্ড। 'কি করে রানা টিউলিপকে কিডন্যাপ করে, বলুন? টিউলিপ কিডন্যাপ হবার আগেই তো সে অসলো-য় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে। দরকার হলে কবর থেকে আবার লাশ তুলব আমরা, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হব সত্যি ওটা মাসুদ রানারই লাশ। জিজ্ঞেস করবেন, তাহলে টিউলিপকে কিডন্যাপ করেছিল কে?' শ্রাগ করলেন তিনি। 'জানি না। সারটভও হতে পারে। যে-ই হোক, সে পালিয়েছে।'

রানার মুখে কথা ফুটল না। জেফ রিকার্ডের মত ব্যক্তিত্ব মিথ্যাচারের আশ্রয় নেবেন না। তারমানে প্রেসিডেন্টের চোখে ধুলো দেবেন তিনি। রানার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ।

একটা হাত তুলে জানালার বাইরেটা দেখালেন জেফ রিকার্ড। 'হোয়াইট হাউসের ওদিকে রাস্তার ওপারে, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট,' বললেন তিনি। 'কিন্তু তথাকথিত সুবিচার নিশ্চিত করা আমার কাজ নয়। আমার হাতে আরও অনেক সমস্যা আছে—যেমন, বিশ্বাস করতে পারি না এমন লোকজনে ভরা সি.আই.এ.। ওটা আমাকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, এবং ক্ষীণ একটু আশা রাখি, অনুরোধ করলে কাজটায় আপনি হয়তো আমাকে কিছুটা সাহায্য না করে পারবেন না।'

'আসলে,' হাসি মুখে বলল রানা, 'প্রথম থেকেই আমি আপনাদের বিরুদ্ধে ছিলাম না।' গোটা ব্যাপারটা খুলে বলল ও।

'কিন্তু আমি সেটা অনেক পরে বুঝেছি,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'একটা সময় গেছে, যখন আপনাকে খুন করতে পারলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হত না। কিন্তু নসোসের পর, হ্যাঁ,

আপনার উদ্দেশ্য আমার কাছে পরিষ্কার হতে শুরু করে। আপনি কি করতে চাইছেন, আমি আন্দাজ করতে পারি। টিউলিপকে হোয়াইট হাউসে পৌঁছে দিয়ে কেটে পড়বেন। পিকনিকের আইডিয়াটা আমার ছিল, আপনি যাতে হোয়াইট হাউসে ঢুকতে পারেন।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি, তারপর হঠাৎ রানার দিকে ফিরলেন। 'কংগ্রাচুলেশন্স, মি. রানা। আপনি একটা কাজই করেছেন।'

'কিন্তু আপনার হাতে আমি ধরা পড়ে গেলাম,' রানার গলায় ক্ষীণ একটু খেদ।

'তার কারণ আমার ব্যাপক ক্ষমতা,' বললেন জেফ রিকার্ড। 'কিন্তু আপনার সাফল্যের কোন তুলনা হয় না। টিউলিপকে আপনি বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন, কারও সাহায্য ছাড়া, ওদিকে দুনিয়ার অর্ধেক ইন্টেলিজেন্স আপনাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। আমি আর আমার বিশ্বস্ত কয়েকজন লোক ছাড়া এখনও কেউ জানে না আপনি কোথায়।' হাত তুলে বাতাসে ঝাপটা দিলেন তিনি। 'অতীত ইতিহাস। আপনার নতুন কেস হেনরি পিকেরিং। রানা এজেন্সির ফি খুব বেশি, জানি। কিন্তু পিকেরিংকে আমার খুব বেশি দরকার। আমাকে মক্কেল হিসেবে রানা এজেন্সি পছন্দ করবে তো?'

'নো, ফি,' বলে পকেট থেকে একটা চাবি বের করল রানা। বাড়িয়ে দিল জেফ রিকার্ডের দিকে। বলল, 'এটা আমি ডাকযোগে আপনার কাছে পাঠাতাম।'

'কিসের চাবি?'

'পিকেরিং।'

চাবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন জেফ রিকার্ড। তারপর রানার দিকে ফিরলেন। 'পিকেরিংকে আপনি কোনও ঘরে আটকে রেখেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'প্যাঁচার মত মুখ করে মেঝেতে পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলেই গড়গড় করে বলে দেবে সব।' ডাডিংটন প্লেসের ঠিকানাটা জানিয়ে দিল ও।

'সেক্ষেত্রে আপনারও একটা চাবি পাওনা হয়েছে,' বলে পকেট থেকে আর একটা চাবি বের করলেন জেফ রিকার্ড। চাবিটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখল রানা। রিঙের সাথে একটা প্লাস্টিক ট্যাগও রয়েছে, তাতে রোড আইল্যাণ্ড এভিনিউয়ের একটা ঠিকানা। রূম নং ৩০২, একজিকিউটিভ হোটেল।

একটা বোতাম টিপলেন জেফ রিকার্ড। গাড়ির গতি কমে এল, ফুটপাথের পাশে থামল ড্রাইভার।

জেফ রিকার্ড রানার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

করমর্দন করল রানা। 'একটা সুতো ঢিল রয়ে গেছে,' বলল ও। 'রিপ নরটন নামে এক ক্লাউনকে দশ হাজার ডলার পেমেণ্ট করতে হবে।'

'ঠিক আছে। কোথায় সে?'

'ইতিমধ্যে নাইরোবিতে পৌঁছে গেছে।'

'নাইরোবি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে নিঃশব্দে হাসল রানা।

নেমে গেল গাড়ি থেকে।

***